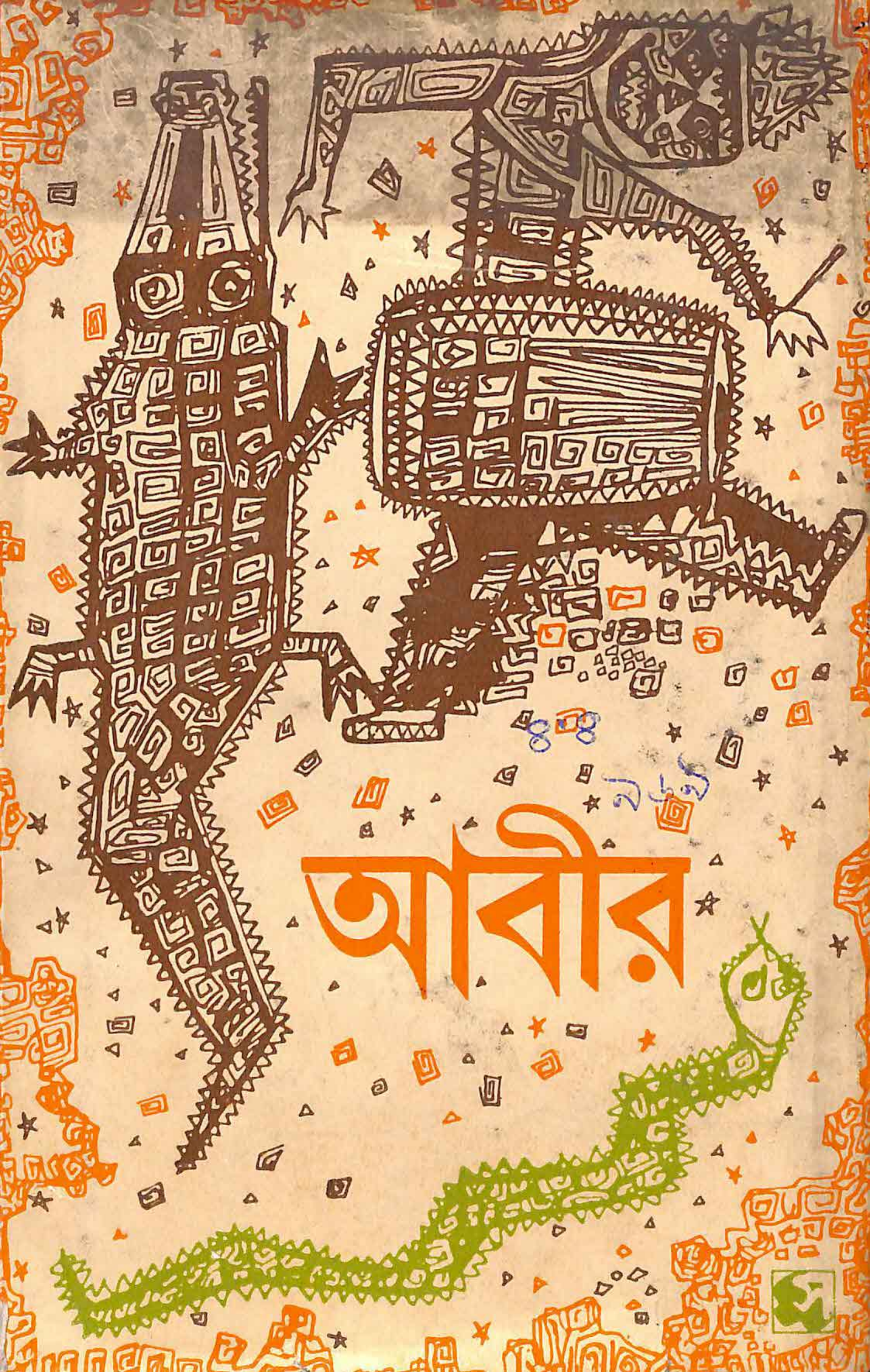

আবীর

৪·৪

৯৬৯

আবীর

সমতট প্রকাশনী
১৭২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-২৯

© সমতট সংস্থা
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ শিল্পী স্বপ্না সেন
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা বিপুল গুহ
অন্যান্য ছবি পুলক সেন সোমা দত্তগুপ্ত মিতা দত্ত ও
রুসীলের শিল্পীরা
প্রুফ দেখেছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ
প্রকাশক অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত সমতট প্রকাশনী
১৭২ রাসবিহারী এভেনিউ কলকাতা ৭০০০২৯
মুদ্রক শ্রীগোপাল দে
২৫/১এ, কালিদাস সিংহ লেন কলিকাতা ৯

সম্পাদনা
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাস্কর বসু
প্রবীর রায়

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮০
২য় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৮
মূল্য ১৫ টাকা

সূচীপত্র


Chandi
NNNN
NNNNN
মাছের বাজার

ভূমিকা

ছোটদের সাহিত্য-সংকলনের অভাব নেই, ছোটদের উপযোগী সাহিত্যেরও হয়ত অভাব নেই। কিন্তু একটা সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো সংকলন এ পর্যন্ত ক'টা হয়েছে, গুণে বলা যায়। আবীর সেই তালিকায় পড়বে কিনা সুধীজনরা বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা এই শিশুসাহিত্য-সংকলনের পেছনে বাণিজ্যবুদ্ধিকে প্রাধান্য দিইনি। সমতট পত্রিকার গত দশ বছরের সংখ্যাগুলি থেকে মনোনীত কিছু ভালো লেখা আর বিশিষ্ট কয়েকজন লেখককে দিয়ে নতুন করে লিখিয়ে-নেওয়া কিছু রচনা দিয়ে আবীর সাজানো হল।

আবীর বসন্ত-উৎসবের উপকরণ, আমরা ছোটদের হাতে আবীর তুলে দিচ্ছি শরৎ-প্রভাতে। উৎসবের দিনগুলো খুশিতে রঙিন হয়ে উঠুক এইটুকুই এই নামের ইঙ্গিত।

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সম্পাদকমণ্ডলী



আলাদীন

অন্নদাশংকর রায়

বিজলীর ধারা এই—
এই আছে এই নেই
এর চেয়ে মোমবাতি ভালো
জবালো, জবালো, হারিকেন জবালো।

কর্‌ক না টিমটিম
তেলে ভরা পিদ্দিম
রাতভর সেও দেয় আলো
জবালো, জবালো, পিদ্দিম জবালো।

পেতলের দীপ বেচে
আলাদীন ঠকে গেছে
যাদ্‌কর দিয়ে গেছে ফাঁকি
ভোগার কী আছে আর বাকি !

কাঁদে বসে আলাদীন
ডাকলে আসে না জিন
স্‌ইচ টিপলে কই আলো ?
সোনার প্রদীপ কিসে ভালো ?

স্‌ইচ টিপলে হাওয়া
আর তো যায় না পাওয়া
গরমে যে তিষ্ঠানো দায়
আলাদীন করে হায় হায় !

কিনে আনে হাতপাখা
দাম দেয় এক টাকা
হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খায়
হাড়ে তার বাতাস লাগায়।

হেনরি কিং এর অকাল মৃত্যু

সত্যজিৎ রায়

হেনরি কিং-এর মাত্র একটি বদ অভ্যাস
দড়ি-কাছি হাতে পেলে করে তারে গ্রাস।
একদিন এক রজ্জুখণ্ড পেটের মধ্যে গিয়ে
রয়ে গেল সেইখানেই বিশ্রী জট পাকিয়ে।
সেরা বৈদ্য হাকিমের হল আগমন
রোগী দেখে করে তারা শির সঞ্চালন।
সকলেরই এক মত—এ এমন ব্যাধি
যার কাছে হার মানে ঔষধ ইত্যাদি ;
এ ব্যাধির শেষ হবে রোগী গেলে মারা।
শুনি কথা পিতা মাতা প্রস্তরের পারা।
প্রাণাধিকেষুর হবে অকাল মরণ
অমোঘ প্রমাণ হবে বিধির লিখন !

শেষ শ্বাস ত্যজিবার এসেছে সময়
হেনকালে হেনরি কিং চক্ষু মেলি কয়—
'আছ যারা উপস্থিত সবারে জানাই
বিধিমতো ভোজনেতে কোনো দোষ নাই ;
খাদ্যভ্রমে রজ্জু যদি করহ ভক্ষণ—'
এতেক বলিয়া হেনরি মুদিল নয়ন ॥

[হিলেয়ার বেলকের 'হেনরি কিং' অবলম্বনে]

ভুতো মামা নেই

সুবীর রায়চৌধুরী

কী হলো অমিয়াংশুর ? বেশ কয়েকদিন কফি হাউসে তার পাত্তা নেই। আমরা নানা জল্পনা-কল্পনা করছি, এমন সময়ে আধ-ময়লা পোশাকে উশকো-খুশকো চুলে সে একদিন এসে হাজির। চেহারা এবং মেজাজ দেখে বোঝাই যাচ্ছিলো যে গুরুতর কিছু একটা ঘটে গেছে। কিন্তু সে নিজে থেকে কিছু বললো না। একটি চারমিনার ধরিয়ে শুধু বললো, 'ভুতো মামা নেই।'

কে ভুতো মামা ? বিখ্যাত কোনো ইউনিভার্সাল মামা, নাকি অমিয়াংশুর কোনো আত্মীয় ? রবিদা জিজ্ঞেস করলেন, 'নেই মানে ? তিনি কি গত হয়েছেন ?'

অমিয়াংশুর সংক্ষিপ্ত জবাব, 'জানি না।'

রবিদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ভীষ্মর মতো ইচ্ছামৃত্যু জাতীয় কিছু ?'

এবারেও একই উত্তর, 'জানি না।'

আমি আর পারছিলাম না। নেই কথার মানে পরে জানা যাবে, আগে ভুতো মামা ব্যক্তিটি কে তার খোঁজ নেওয়া যাক ! সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো একদিন বলেছিলেন যে আপনার মামা বাড়ির কেউ আর বেঁচে নেই। ভুতো মামা কি তবে আপনার পাতানো মামা ?'

অমিয়াংশু বললো, 'আমার দূর সম্পর্কের মামা—দারুণ একরোখা, জেদি আর একগুঁয়ে। ভুতো মামা আক্ষরিক অর্থে বজ্রের মতো কঠোর, হাইড্রোজেন বোমার মতো ভয়ংকর। তিনি থাকলে আর রক্ষে ছিলো না।'

এত হেঁয়ালি আর কাঁহাতক সহ্য হয়। আমরা এক সঙ্গে বলে উঠলাম, 'দাদা, আর কত রহস্য করবেন। যা বলার বলেই ফেলুন না।'

অমিয়াংশু বললো, 'আমি ও তো তা-ই চাই। আমারও তো কাউকে না বলতে পেরে পেট ফেঁপে উঠছে। কিন্তু গোড়াতেই আপনারা ভুতো মামার ঠিকুজি-কুষ্ঠি নিয়ে এতো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যে আসল কথাটা বলার সুযোগই পাচ্ছিলাম না। তবে শুনুন…' অমিয়াংশু শুরু করলো :

আমার ভুতো মামা আঁদুলে থাকেন। একদিন ভোরবেলায় তার বৌ আন্নাকালী মামির টেলিগ্রাম পেলাম, তার মর্মার্থ, ভুতো মামায় মাথায় বাজ পড়েছে। অবস্থা আশংকাজনক। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

শুনে আমার মাথায়ও বাজ পড়ার মতো অবস্থা। অমন স্বাস্থ্য—হঠাৎ কী অঘটন ঘটলো। আন্নাকালী মামির কথা ভাবা যায় না। ছেলেপুলে নেই—কী যে হবে।

ইলেকট্রিক ট্রেন, আঁদুল যেতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। নেমেই হারুর রিক্শা পেয়ে গেলাম। হারুর বাড়ি ভুতো মামার বাড়ির কাছেই। প্রজাই বলা যায়। ভালোই হলো, ওর সঙ্গে গল্প করতে-করতে যাওয়া যাবে। রিকশায় চেপে হারুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভুতো মামার খবর কী?'

হারু বললো, 'এমনিতে তো বেশ ভালো। চেহারা দেখে মনে হবে দশ-পনেরো বছর বয়েস কমে গেছে। কিন্তু মাথায় সেই যে বাজ পড়লো তার পর থেকে গোঁয়ারতুমি হাজার গুণ বেড়েছে। বাবু, আপনি তো জানেনই, উনি যা দেখতে পারেন না, তাকেই বিলকুল উড়িয়ে দেন। হারাধন মাইতির সঙ্গে ঝগড়া, তাই বলতেন, হারাধন মাইতি বলে দুনিয়ায় কেউ নেই। গোষ্ঠবাবুর গোয়ালে অনেক মোটাসোটা দুধেল মুলতানি গাই আছে, সেটি বাবুর সহ্য হয় না। বলে বসলেন, 'তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছো? কোথায় গোষ্ঠবাবুর গোয়াল? ধু ধু করছে মাঠ।' মাথায় বাজও পড়লো জিদের জন্য। কদিন বলেছি বাবু, ঝড়-বাদলার সময় ফাঁকা মাঠে গাছতলায় দাঁড়িওনি। কে শোনে কার কথা! ভুরু কুঁচকে বললো কি জানেন বাবু, 'বাজ আবার কী? বাবা, বাজ কি তোমার হুকুমের চাকর?' ফলও পেলো হাতে-হাতে। সেদিন ঐ ঝড়ের মধ্যে ফাঁকা মাঠে তালগাছের তলায় দাঁড়ালো, আর বাজও মালুম দিলো যে সে আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা প্রাণে বাঁচলেন কী করে? পুড়ে ঝলশে যাননি?'

—'না বাবু, শুধু প্রাণে যে বেঁচেছেন তাই নয়, চেহারাও অনেক ভালো হয়েছে। দূর থেকে খোকাবাবুটি দেখায়। তবে পুরানো ব্যামোটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। সেই যে মনে আছে, বছর দশেক আগে গরুর গাড়ি থেকে পড়ে ওঁর ধারণা হয়েছিলো যে তিনি আঁদুলের ভুতো মুখুজ্যে না, গুরখা জওয়ান বাহাদুর সিং। এখন থেকে-থেকে সেই কথাই বলেন।'

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ চোখে পড়লো ইস্কুল বাড়ির সামনে প্রতিষ্ঠাতা পাঁচু মোড়লের মূর্তিটা নেই। পাঁচু মোড়ল বেঁচে থাকতে-থাকতে তাঁরই উৎসাহে মূর্তিটা করা হয়েছিলো। তিনি বলতেন, 'শুভস্য শীঘ্রং। এ-কাজ তো তোমাদের একদিন করতেই হবে, তাই আমি বেঁচে থাকতে থাকতে করলে আমিও দেখে যেতে পারবো।' শোনা যায়, মূর্তি তৈরির ঠিকেদারিটাও তিনিই নিয়েছিলেন। এই পাঁচু মোড়লের সঙ্গে ভুতো মামার, আদা আর কাঁচকলার সম্পর্ক ছিলো। পাঁচু মোড়ল মারা যাবার পরেও ভুতো মামার রাগ পড়ে নি। ইদানীংও বলতে শুনেছি, 'পাঁচু আবার কে? ও নামে কেউ নেই।' তাই হঠাৎ মূর্তিটা দেখতে না পেয়ে বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। হারুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মূর্তিটা কোথায় গেলো রে?'

হারু বললো, 'ভানুমতীর খেল বাবু ভানুমতীর খেল। আমার সামনে না ঘটলে আমারই পেত্যয় হতো না। গেলো হাটবারে ইস্কুল বাড়ির উল্টো দিকে আমি চা খাবার জন্য ঢুকেছি। তখন বেলা দুটো হবে। ভাবছিলাম একটু জল-টল খেয়ে এবার বাড়ি যাবো। এমন সময় আপনার ভুতো মামাও চা খেতে হাজির। বেশ ভালোই কথাবার্তা হচ্ছিলো। আমার কী যে দুর্মতি হলো, হঠাৎ বললাম, বাবু, নতুন হেড মাস্টারের আমলে ইস্কুলের ছিরি ছাঁদ একেবারে গেছে। দেখেছো পাঁচু মোড়লের ইশট্যাচুটাতে কাগ-পায়রায় হেগে একসার করেছে—কেউ পরিষ্কারও করে না।' সঙ্গে সঙ্গে ভুতো মামা রেগে আগুন, 'পাঁচু মোড়ল কে ? তার আবার স্ট্যাচু কোথায়। —কোথাও কিছু নেই।' বাবু তারপর ভরদুপুরে এক হাট লোকের সামনে তাজ্জব ব্যাপার ঘটলো, সঙ্গে সঙ্গে ইশট্যাচুটা হাওয়া। কোথা দিয়ে যে লোপাট হলো কেউ হদিশই পেলে না। ভাগ্যিশ কাল ইস্কুল ছিলো না। ঐ কাণ্ড দেখে ছেলেগুলোর কী অবস্থা হতো, ভাবুন দেখিনি। কী বলবো বাবু যে জিনিস চোখে দেখা যায় না তাকে বিশ্বাস করতে ঢের লোককে দেখেছি, যেমন ভূত ভগবান। কিন্তু যে জিনিস চোখের সামনে আছে, তাকে না মানতে ভুতো মামা ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। আজ, বাজ পড়ার পর তার এমন খ্যামতা হয়েছে যে, তিনি যা দেখতে পারেন না, তাকেই হাওয়া করে দিতে পারেন। বাবু দুনিয়ায় কত আজব কাণ্ডই না ঘটে।'

আমি ভুতো মামার বাড়ি এসে গিয়েছিলাম। হারুকে বিদেয় করে উঠোনে এসে দাঁড়াতে আন্নাকালী মামি দাওয়া থেকে ছুটে এলেন, 'অমি, এসেছিস ? তোর আশায় বসে আছি। আমার কপালে যে কী আছে।'

আমি বললাম, 'ভুতো মামা কোথায় ? এখন কেমন আছেন ?'

মামি উত্তর করলেন, 'ঐ তো পাশের বাড়ি থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসছেন। এমনিতে তো ভালো আছেন—স্বাস্থ্য বরং আগের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু ব্যামোটা যে সব্বোনেশে। যাক গে, এখন কিছু বলবো না। পরে কথা হবে। ঐ যে উনি এসে পড়েছেন। খবরদার উনি যেন একটুও সন্দেহ না করেন যে তুই ওর অসুখের খবর পেয়ে এসেছিস।'

আমি তবুও বললাম, 'মামি ঐ স্ট্যাচু উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা সত্যি ?'

মামি উত্তর দেবার আগেই ভুতো মামা এসে পড়লেন। মামাকে প্রণাম করতেই বেশ স্বাভাবিক ভাবে বললেন, 'কী রে অমি, কী খবর ?' কিন্তু আমার কাধে হাত রাখতেই মনে হলো যেন প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেলাম। অনেক সময় ভিজে তারে ডি সি তে শক দিয়ে যেরকম ছিটকে ফেলে দেয়, প্রায় সে রকম। তবে সেটা নার্ভাসনেস থেকেও হতে পারে। কী বলবো, কী বলবো এরকম ইতস্তত করতে করতে বললাম, 'মামা, দ্যাখো তোমার পাশের নবীন সারেঙ্গির খেতে কী সুন্দর সব্জি হয়েছে !'

মামা নির্বিকার ভাবে বললেন, 'নবীন সারেঙ্গির খেত কোথায় দেখছিস ? সব তো জঙ্গল।'

আমি হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে। তারপর আড়চোখে তাকালাম নবীন সারেঙ্গির খেতের দিকে। কোথায় খেত ? একেবারে আগাছায় ভর্তি জঙ্গল। শেষকালে কি রাম-নাম জপ করবো ? মামার মুখ প্রসন্ন, প্রশান্ত। আস্তে আস্তে মামা খবরের কাগজটা বগলদাবা করে বৈঠকখানায় চলে গেলেন।

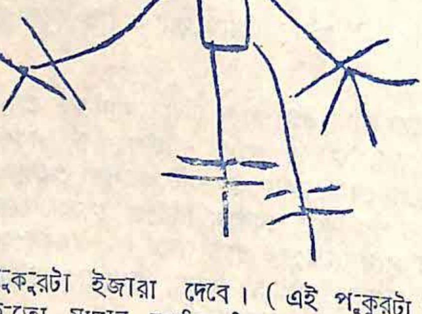
আমি হেঁশেলে গিয়ে মামির পাশে বসলাম। আমার তখনো ঘোর কাটেনি। তবুও মামির কাছে সে ব্যাপারটা চেপে গিয়ে বললাম, 'কই, আমার কথার জবাব দিলে না। ঐ স্ট্যাচুর…,

—হ্যাঁরে। মা শেতলার দিব্যি, তারপরেই তো তোকে তার করলাম।

—তুমি কি বলতে চাও যে উনি যা দেখতে পারেন না, তাই অদৃশ্য হয়ে যায় ?

—'ঠিক তাই। ভয়ে আমার গা-হাত-পা সেঁধিয়ে আসে। আর জানিসই তো দুনিয়ার খুব কম জিনিসই উনি পছন্দ করেন। কোনদিন হয়তো বলবেন ওর শ্বশুরবাড়ি বাঁকুড়া নেই—ভেবে দ্যাখ কত লোক ঐ জেলায় থাকে, নিমেষে তারা মিলিয়ে যাবে। আমি সব সময়ে ভয়ে মরি কোনদিন মা গঙ্গাকে না তুলে দেন। মা গঙ্গা দোষ নিও না। এখন যদি বল্লেন দামোদর বাঁধ নেই, তাহলে আর দেখতে হবে না। বাঁধ ভাসবে, কত লোকের যে জান যাবে তার ইয়ত্তা নেই।'

—'ডাক্তার কী বলছেন ?'



—তিনি তো রোগ ধরতে পারছেন না। বলছেন কলকাতায় নিয়ে যেতে—বেশি জোরজার করাও মুস্কিল! কোনদিন বলে বসবেন কলকাতা নেই। ব্যাস আর দেখতে হবে না।'

আমরা কথা বলছিলাম, এমন সময় ভুতো মামা কাগজ হাতে রান্না ঘরে এলেন 'দেখেছো গিন্নি কাগজে কী সব গাঁজাখুরি বিজ্ঞাপন বেরোয়। লিখেছে শিবনাথ মুখুজ্যে তার উত্তরের পুকুরটা ইজারা দেবে। (এই পুকুরটা আসলে ভুতো মামারই ছিলো। ভুতো মামার জ্ঞাতি শিবনাথ মুখুজ্যে ঠকিয়ে নিয়ে নেয়। সেই থেকে

মামা তার নাম শুনতে পারেন না।) আরে বাবা, শিবনাথ মুখুজ্যের কোনো পুকুর থাকলে ইজারা দেবে। ওর কোনো পুকুর নেই।'

মামা খুব শান্ত অবিচল গলায় কথাগুলো বললেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যা হবার তা হয়ে গেলো। চোখের সামনে দেখলাম উত্তরের বড়ো পুকুরটা মাঠ হয়ে গেছে—কোনদিন যে সেখানে পুকুর ছিলো তা দেখে মনেও হয় না। এখুখুনি হয়তো রাজ্যের ছেলেরা জুটবে খেলার জন্য।

মামি শুধু বললেন, 'আমার তো মরণ নেই। আমার হয়েছে যতো জ্বালা। যা তো আবার কাকে অদৃশ্য করে দেন।'

ঘরে গিয়ে দেখলাম মামা তখন চেঁচিয়ে আপন মনে কাগজ পড়ছেন : 'ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিপর্যয়। মাত্র ৪২ রানে সকলে আউট। অধিনায়ক অজিত ওয়াড়েকরের শোচনীয় পরিস্থিতি'। খবরটা পড়েই মামার টিপ্পনী শুরু হলো : 'কাগজওয়ালাদের কী হয়েছে বল্ তো? ক্যাপ্টেনের নামটাও জানে না। ভারতের অধিনায়ক তো পতৌদি। অজিত ওয়াড়েকার বলে··'

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'মামা তোমার চায়ে আরশোলা।'

ভুতো মামা বললেন, 'কোথায়?'

আমি দেখালাম, 'ঐ যে।' চায়ে সত্যি-সত্যি আরশোলা বসেছিলো বলে অজিত ওয়াড়েকর এ-যাত্রা রেহাই পেয়ে গেলেন। কিন্তু ভয় হয়, এখনো তো একটা টেস্ট বাকি আছে, প্রায় রোজই অজিত ওয়াড়েকরের নাম বেরোয়। কখন কী যে ঘটে, কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু মামাকে সামলানো কি আমার কর্ম। খানিক বাদে পিওন চিঠি দিয়ে গেলো, ইনকাম ট্যাক্সের চিঠি। ভুতো মামা বহুদিন যাবৎ ট্যাক্স দিচ্ছেন না, তাই পাওনা টাকার তাগাদা। চিঠি পড়েই মামা রেগে টং : 'ইনকাম ট্যাক্স আবার কী? ও বস্তু বলে কিছু নেই। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বলেও কিছু নেই। যত্তো সব বাজে।'

আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম কলকাতার দশতলা দপ্তরে বসে কাজ করতে-করতে জলজ্যান্ত ইনকাম ট্যাক্স অফিসার হাওয়া হয়ে গেলেন। ভুতো মামা তখন অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়েছেন। মাঠে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'শুনেছিস্ মার্কিনিদের কীর্তি। অ্যাপোলো ৮ না কি ছাইভস্ম চাঁদের দেশে পাঠিয়েছে। আরে বাবা, চাঁদ থাকলে তো চাঁদের দেশে যাবে। চাঁদ ব'লে···'

—ভুতো মামা, তোমার টাকে মশা।' বলেই ঠাঁই করে এক চাঁটি লাগালাম মামার টাকে। চাঁদ এ যাত্রা বেঁচে গেলেও চাঁটি খেয়ে মামার পুরনো রোগটা চাগিয়ে উঠলো। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'কে তোর ভুতো মামা? আমি গুরখা রেজিমেণ্টের ব্রিগেডিয়ার বাহাদুর সিং। আমি এখন ক্যাম্প থেকে ক্যাণ্টিন্নারে যাবো।

এই বলে ডবল মার্চ করতে-করতে বেরিয়ে গেলেন। খানিকবাদে লাঠিটাকে বন্দুকের মতো ধরে লেফ্‌ট-রাইট লেফ্‌ট-রাইট করতে-করতে ফিরে এলেন। দোরগোড়ায় আন্নাকালী মামিকে দেখে শুরু হলো ধমকানি: 'এ কি আজ পি. টি.তে যাওনি কেন? তোমার কোর্ট মার্শাল হবে। দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি...'

মামা তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। আমি আর মামি দরজায় আড়ি পেতে সব শুনছি। মামা বিড়বিড় করে বকে চলেছেন: 'আমি ব্রিগেডিয়ার বাহাদুর সিং—আমাকে বলে কিনা ভুতো মামা। যত্তো সব। ভুতো মামা কে? ভূতনাথ মুখুজ্জে বলে কেউ আছে নাকি? ও নামে কেউ নেই।'

তারপর সব নিস্তব্ধ। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমরা ভয়ে-ভয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, ভুতো মামা নেই···শুধু একটা জ্বলন্ত সিগারেট মেঝেতে পড়ে আছে। তখনো তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। *

---

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

শঙ্খচূর্ণিকা ঠাকরুণ

নবনীতা দেব সেন

এক গ্রামে এক কাঠুরে ছিল; তার দুই মেয়ে, পিকপিক আর টুমটুম। পিকপিক বড়ো, সে শান্ত, শিষ্ট, বুদ্ধিমতী। টুমটুম ছোট; সে একটু দুষ্টু আছে, একটু বোকা আছে। ভদ্রতা সভ্যতা এখনও বেশি শেখেনি। লোকের সামনে খালি পায়ে চলে আসে, নাক-টাক খুঁটে ফেলে, টাক দেখলে হেসে ফেলে, টিকি দেখলেই টেনে ফেলে। কিন্তু টুমটুম খুব সাহসী। সে তো বই পড়তে শেখেনি, ভূতের গপ্পো-টপ্পো পড়েনি; ভূত যে আছে, তা-ই সে জানে না; পিকপিক কিন্তু জানে। সে খুঁটিয়ে জানে শাঁকচুন্নী কেমন হয়, মেছোপেত্নী কী চায়, বেম্মদাত্যি কেমন দেখতে, মামদোর স্বভাব কেমনধারা। পিকপিক তাই অন্ধকারে বেরুতে চায় না। একলা ঘরে থাকতে চায় না। কিন্তু ছোট বোনটি পাছে ভয় পায়, তাই ভূত পেত্নীর কথা কিছু বলেওনা; কিন্তু ঠিক সামলে সুমলে রাখে।

ঠিক দুকখুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা, তাই তখন সে টুমটুমকে মাঠে যেতে দেয় না, গাব গাছের কাছে তো নয়ই। সন্ধ্যে হলেই আশশ্যাওড়ার পাশ দিয়ে হাঁটা বারণ। অমাবস্যের রাতে বেলগাছের ধারকাছ দিয়ে যেতে দেয়



না বোনটিকে; কিন্তু টুমটুম তো বোঝে না কেন বারণ করে! তাই সে মাঝে মাঝে ভুলে ভুলে চলে যায়।

একদিন কাঠুরে গেছে বনে কাঠ কাটতে; পিকপিক মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজকম্মো করছে, টুমটুম দেখে গাবগাছের ডগাতে একটা লাল টুকটুকে

চৌথুপী ঘুড়ি আটকে আছে। অমিন টুমটুম গাছে চড়তে গেল! গাছে পা দিয়েই শোনে, একটা গলা: "এঁ্যাই তুঁই আঁমার গাঁছে চঁড়ছিঁস কেঁন?" —টুমটুম এতই বোকা, সে জানেও না যে ভূত পেত্নীরা নাকী সুরে কথা কয়। সে বললে—"তুমি কে গা? তোমার গলায় কী হয়েছে? তোমার গলা ওরকম শোনাচ্ছে কেন?" শুনে শাঁকচুন্নী তো অবাক। আচ্ছা মেয়ে তো? শাঁকচুন্নী চেনে না? সে বললে "আঁমিঁ শ্রীঁশ্রীঁশঁঙখচুঁর্ণিঁকাঁ দেঁবীঁ।" টুমটুম ভাবলে এ আবার কোন দেবীরে বাবা? তেত্রিশ কোটির মধ্যে একজন হবেন! বুদ্ধি করে বললে— "পেন্নাম হই ঠাকরুণ। আমি টুমটুম। ঐ ঘুড়িটা ধরতে এসেছি। তোমার গলায় কী হয়েছে? টনসিল? একটু গার্গল করবে?" শাঁকচুন্নী প্রণাম পেয়ে খুব খুশি। আরো খুশি গার্গল করার কথা শুনে। তার আবার প্রাণে গানবাজনার খুব শখ। আর তার ভূতজীবনের আদর্শ হচ্ছে লতা মঙ্গেশকরের মতো গান গাওয়া। ঐ নাকী সুরের জন্যই যত গণ্ডগোল হয়ে যায়। শাঁকচুন্নী ভাবলে এই সুযোগে যদি নাকী গলাটা সারিয়ে নিয়ে লতার মতন করে ফেলা যায় তা ছাড়ি কেন? সে বলল—"গাঁর্গলটা কঁী জিঁনিস?" ব্যাপার দেখে টুমটুমের তো গালে হাত! অবাক হয়ে সে বললে—"তুমি কোথাকার লোক? গার্গল জানো না? মুখে নুন-গরম জলের আঁজলা নিয়ে গলায় গড়গড় শব্দ করতে হয়। তাহলেই গলা সেরে যায়। তা তুমি কোত্থেকে কথা কইচো? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো?" শাঁকচুন্নী বললে— "দেঁখেঁ কি হঁবে? কঁথা তোঁ শুঁনতেঁ পাঁচ্ছোঁ?"

শাঁকচুন্নীকে দেখতে যে ভাল নয়, সে নিজেও তা জানে। তার টুমটুমের পুতুলের মতন চেহারার সামনে বেরুতে লজ্জা করলো। ভয় দেখানোর জন্যেই যে চেহারাটা তৈরি, তাই নিয়ে ভাব করা যায় কি? শাঁকচুন্নী তো বুঝে ফেলেছে যে টুমটুম ভয় পাবে না, বরং তাকে দেখলে কৌতূহলী হবে। হয়তো বলবে: ও কি ভাই তোমার দাঁতগুলো অত বড়ো বড়ো কেন, অতো হলদে কেন? মাজো না বুঝি? কিংবা বলবে: ও কী! তোমার হাত পাগুলো অমন কাঠি কাঠি হয়ে গেল কী জন্যে? অসুখ করেছিল?

অথবা বলবে: আরে! আরে! ও কেমন পা তোমার? গোড়ালিদুটো সামনের দিকে কেন? অত বড় বড় চুল কেন রেখেছো? অত লম্বা লম্বা নোখ কেন বাড়িয়েছো? কাটতে পারোনি। আনো দেখি কাঁচি। সাতপাঁচ এইসব ভেবে ভেবে শাঁকচুন্নীর মনে বুদ্ধি এল। বললে—"দেঁবতাঁদের কিঁ অঁমন চঁট কঁরে দেঁখতে পাঁওয়া যাঁয়?"

বোকা হলেও টুমটুমের বুদ্ধি আছে। সে বললে—"তুমি যদি দেবতা হও তাহলে আমাকে একটা বর দাও তো দেখি?"

শাঁকচুন্নী বললে—"কীঁ বঁর?"

টুমটুম বললে—"ঐ লাল ঘুড়িটা পেড়ে দাও তো।" — "এঁ — ইঁ" বলে শাঁকচুন্নী টুক করে ঘুড়িটা ফেলে দিলে ওপর থেকে।

টুমটুম তো অবাক! আরে? এ যে সত্যিই দেবী। টুমটুম বললে— "আরো বর দিতে পারো নাকি তুমি? তাহলে দাও দিকিনি আমার বাবার জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি বানিয়ে? মাথায় করে বয়ে কাঠ আনতে আমার বাবার খুব কষ্ট হয়।"

শাঁকচুন্নী বললে—"এ্যঁ আঁর এঁমন কী?" বলেই হাত বাড়িয়ে পাশের গাঁ থেকে একটা ঠেলাগাড়ি এনে দিলে। টুমটুম তার হাতখানা দেখতে পেলে না। শুধু চক্ষের নিমেষে দেখলে তার পাশে এক ঠেলাগাড়ি। ভূতেরা ইচ্ছে মতন অদৃশ্য থাকতে পারে। টুমটুম ইচ্ছে করলেও পাঁচ মিনিটের জন্যেও অদৃশ্য হতে পারে না। না পেরে তার অসুবিধা হয় প্রায়ই। অদৃশ্য হয়ে যদি রুন্টুদের পেয়ারা গাছে চড়া যেতো, অদৃশ্য হয়ে যদি মার আচারের বয়াম পাড়া যেতো, ইশকুলে পণ্ডিতমশাই পড়া ধরবার সময়ে যদি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যেতো, ইত্যাদি নানা দরকার থাকে টুমটুমের। কিন্তু সে তো দেবতা নয়। সে ভাবলে, দেবতাদের কী মজা। যেমন খুশি দেখা দেন, বাকি সময়টা অদৃশ্য থাকতে পারেন। টুমটুমেরও ঠিক তাই হলে ভালো লাগতো। যাকগে বেঁচে থেকে তো কেউ দেবতা হতে পারে না, টুমটুম তাই বেশিক্ষণ মন খারাপ করলে না ঐ নিয়ে। হাতে ঘুড়ি। পাশেই বাবার নতুন ঠেলাগাড়ি। টুমটুমের মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে বললে—"তা ছংকচুনিকা ঠাকুর। তুমি একটু প্রসাদ খাবে?" টুমটুম তো ছেলেমানুষ। জানে না যে ঠাকুররা 'নৈবেদ্য' খান, আর মানুষ ঠাকুরদের এঁটো কলাবাতাসাটা 'প্রসাদ' বলে খায়। ঠাকুর আবার 'প্রসাদ' খাবে কি? কিন্তু ও দেখেছে প্রসাদের জন্যে ওর মা কলা কাটেন, বাতাসা কিনে রাখেন। টুমটুম একছুটে বাড়ি গিয়ে দুটো বড় বড় বাতাসা নিয়ে এল শাঁকচুন্নীর জন্যে। "এই নাও। প্রসাদ খাও।"

শাঁকচুন্নী বেচারী পাতকুড়ানো নোংরা খায়, শ্মশানে মশানে মরা জিনিস খায়, আঁস্তাকুড় থেকে ছাইপাঁশ খায়, সে তো কখনো বাতাসা খেতে পায়নি। তার এত ভালো লাগলো বাতাসা মুখে দিয়ে, মনে হলো যেন অমৃত! সে তক্ষুনি টুমটুমকে আরেকটু ভালোবেসে ফেললে। টুমটুম ততক্ষণে বাড়ী গিয়ে গেলাশে করে তার জন্যে নুন-গরমজল নিয়ে এসেছে। যেমন টুমটুমের হাত থেকে বাতাসা দুটো হঠাৎ ম্যাজিকের মতো উবে গিয়েছিল, তেমনি গেলাশটাও টুক করে অদৃশ্য হয়ে গেল। টুমটুম বললে: "এ জলটা যেন খেওনা, গার্গল করতে দিয়েছি। তোমার নাকী গলাটা আমার বিচ্ছিরি লাগছে।"

শাঁকচুন্নী বললে। "বাঃ। এঁই বুঁঝি গাঁর্গল?" বলেই তিনতুড়ি দিয়ে গেয়ে উঠল—"হঁম্ তুম্সে প্যার কঁর লুংগী, বাঁতেঁ হজার কঁর লুংগী।"

টুমটুম বল্লে—"ও কী গো? ও যে খুব পুরোনো গান? নতুন কিছু জানো না?"

শাঁকচুন্নী তখন গাইলে—"তোঁমাঁর হঁলঁ সুঁরু আঁমাঁর হঁলঁ সারাঁ।" – এ গানটা বেশ ভালই লাগল টুমটুমের। সে ভাবলে—আশ্চর্য। ঠাকুররাও গান করেন তা তো জানতাম না? ভাবতাম তারা বুঝি কেবল স্তোত্র পড়েন, আর নমস্তস্য, নমস্তুতে এইসব করেন। সে বল্লে "ঠাকুর তুমি গার্গলটা করে নাও। জল জুড়িয়ে যাবে।" বলে ঘুড়ি নিয়ে খেলতে চলে গেল।

এদিকে শাঁকচুন্নী তো প্রাণপণে গার্গল করছে। সে লতা হবেই। সবটা নুন জল ফুরিয়ে যেতে গেলাশটি হাত বাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে নিয়েছে নুনজলের জন্যে। শ্মশান থেকে চিতার আগুনে সেঁকে জলটা গরমও করে নিয়েছে। আরো গার্গল করছে। কিছুতেই নাকি ভাবটি কাটছে না। একটুর জন্যে ঠিক লতাটাইপ আওয়াজটা বেরিয়েও বেরুচ্ছে না!

পিকপিক এমন সময়ে বোনকে খুঁজতে এদিকে আসছিল। হঠাৎ শুনলে গাবগাছ থেকে গঁড় গঁড়—গঁড় গঁড় শব্দ, তার পরেই ঝপাস করে গরম গরম কী যেন তার মাথায় পড়ল। আর যাবে কোথায় "বাবাগো-মাগো" বলে যেই সে পালাতে যাবে অমনি গাছের শেকড়ে পা জড়িয়ে ধপাস্। টুমমুম ছুটে এসে দিদিকে তুললে, দিদির মাথা ভিজে ভিজে। ব্যাপার শুনে বললে—"ও কিছু না। ও তুই মাথাটা পুকুরে ধুয়ে ফ্যাল্। ছংকচুন্নিকা দেবী গার্গল করছেন। শুনে তো পিকপিক আবার পড়ে যাবার যো—"সে কী।" টুমটুম বল্লে—"হঁ্যা। ঠাকরুণের গলাটা ধরেছে কিনা, গান গাইতে পারছেন না। আমি তাই নুন জল দিয়েছি।" "পিকপিক ভয় পেলেও বুদ্ধি হারায় না। সে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করলে, কী হচ্ছে। টুমটুম ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেই পুরো গল্পটা বললে। ঘুড়ির প্রমাণ তার হাতেই। আর বাবার জন্যে ঠেলা গাড়িখানা গাবগাছে হেলানো রয়েছে। দেখেশুনে পিকপিক ক্রমে ধাতস্থ হোল। সে বুঝল শাঁকচুন্নীটা লোক ভালই, মিশুক আছে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের যার-তার সঙ্গে মেশা তো উচিত নয়? হলেই বা ভাল লোক, ভূত তো সে? কখন মেজাজ খারাপ থাকবে, ঘাড়-টাড় মটকে ফেলবে, তার ঠিক কী? পিকপিক একমনে ভাবতে লাগলো, কী করা? কী করলে ভূত রাগ করবে না, ভূতের ক্ষতি হবে না, আবার এই মেলামেশাও বন্ধ হবে। তারপর বললে: "আচ্ছা টুমটুম, শংখচূর্ণিকা ঠাকুরণ কি বিশ্বসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চান?"

গাছের ওপর থেকে জবাব এল: "সেঁটা কোঁথাঁয় হঁবেঁ ভাঁই?"

পিকপিক এই প্রথম স্বকর্ণে ভূতের ভাষা শুনলে। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবলে : কৈ, ভয় তো করছে না ? বরং সে বুঝলে, ওষুধ ধরেছে। শাঁকচুন্নী মজেছে। বললে—"স্কটল্যাণ্ডে হচ্ছে। এডিনবরা শহরে।"

শাঁকচুন্নী বললে—"ক'বে হ'বে ?"

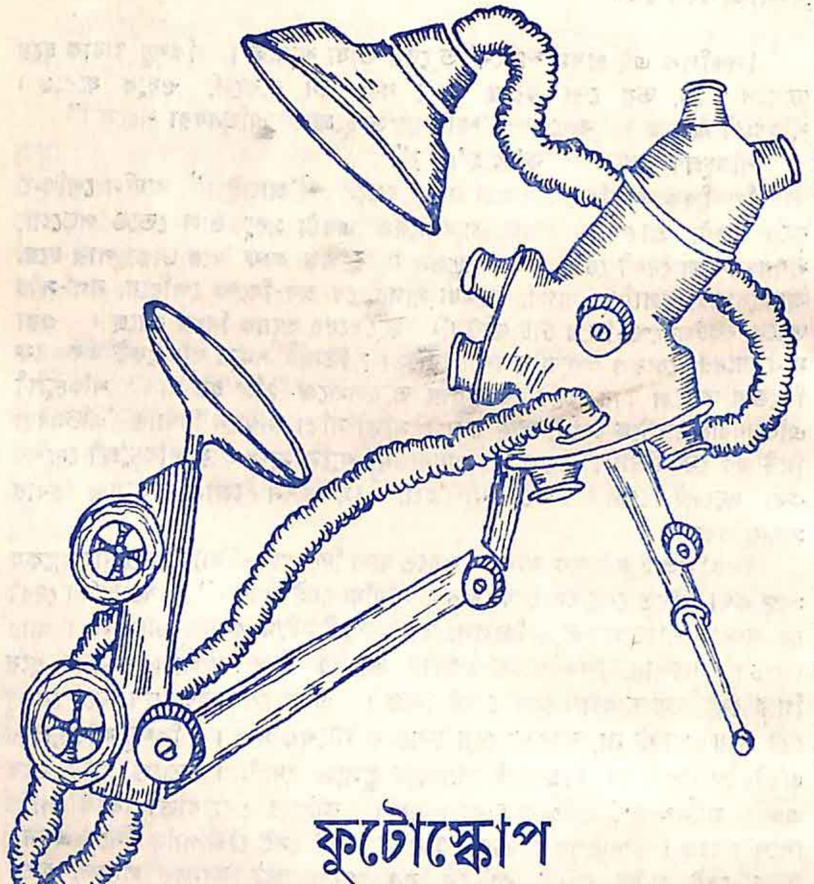
পিকপিক কালবিলম্ব করলে না। বললে—"আজই।" অমনি শোঁও-ত্ত করে একটা আওয়াজ হলো, গাবগাছের একটা সরু ডাল ভেঙে পড়লো, শঙখচূর্ণিকা দেবী টেক্-অফ্ করলেন। —এক লম্ফ দিয়ে ডাঙা পার হয়ে, আরবসাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর, বে-অব-বিস্কে পেরিয়ে, নর্থ-সীর তীরে, স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে টাচ-ডাউন। ভূতেদের অনেক নিয়ম আছে। ওরা মানুষেদের চেয়েও ওল্ড ফ্যাশানের তো ? তিনটে সমুদ্র যদি কেউ একলাফে ডিঙোয় তাহলে তার আর ভারতীয় ভূতসমাজে ঠাঁই হয় না। শাঁকচুন্নী এডিনবরায় পেঁ'ছে দেখে, তাই তো। সত্যি সত্যি সেখানে বিখ্যাত 'এডিনবরা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল' হচ্ছে। গানবাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে শাঁকচুন্নী দেশের কথা ভুলেই গেল। লতা না হয়ে সে এখন জোন বায়েজ হবার সাধনা করছে।

পিকপিক টুমটুমকে সাবধান করতে বলে দিয়েছে—"দ্যাখ, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা কইতে নেই সে দেব, দানব, মনিষ্যি যেই হোক।" শঙখচূর্ণিকা দেবী যে আসলে শাঁকচুন্নী ভূত ছিলেন, তা কিন্তু টুমটুম এখনও জানে না। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পিকপিকের একবার ভূতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়ে সেই ভয়-ভাবটাও যেন কেটে গেছে। এখন সে গাবগাছের নিচে যেতে তো ভয় পায়ই না, আশশ্যাওড়া ঝোপের পাশেও যায়। কিন্তু শাঁকচুন্নীর এঁটো গেলাশটা সে কিছুতেই রান্নাঘরে তুলতে দেয়নি। তাতে মাটি ভরে একটা মানিপ্ল্যাণ্ট লাগিয়েছে বারান্দায়। কাঠুরে তো বাড়ী ফিরে গাড়ি দেখে অবাক। তারপর সাতদিনেও যখন কেউ সেই ঠেলাগাড়ি নিতে এলনা, তখন সেই গাড়ি করেই কাঠুরে বন থেকে কাঠ আনতে লাগল, হাটে কাঠ নিয়ে যেতে সুরু করল। আর মনে মনে শাঁকচুন্নীকে থ্যাংকিউ বলল। টুমটুমের কিন্তু অতশত বুদ্ধি নেই। গাছের উঁচু ডালে ঘুড়ি আটকে থাকতে দেখলেই তার মনে হয়—আহা গো শঙখচূর্ণিকা ঠাকরুণ যদি স্কটল্যাণ্ডে চলে না যেতেন ?

পিক পিক পিকোলো
নাক এত টিকোলো
বাবা মাঝে মাঝে কন
'নাকখানা কি হলো ?'
পিকোলো চমকে বলে
'এখখুনি তো ছিলো।'

পিকো
টু
ম্পা
র
ছ
ড়া ছ
ছ ড়া
ড়ি ছ
ড়ি

টুম্পু সোনা টুম্পা টুম
টুংসোনাদা—ঘুম-পা ঘুম
অর্জি দরজী দার্জিলিং
নিমগাছেতে হচ্ছে সিম
টুম্পা কহেন—অতঃ কিম ?
ঘুম সোনাদা টুংপা টিং।



ফুটোস্কোপ

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সকালবেলা কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা খবরের দিকে চোখ পড়ায় চমকে উঠলাম। খবরটা এই রকম :

নতুন ভূমিকায় ডাক্তার চট্টখণ্ডী
(নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট)

এককালের বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর সম্রাট চট্টখণ্ডী, যিনি নাকি কিছুদিন আগে মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলেছেন বলে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁকে সম্প্রতি এক নতুন ভূমিকায়

দেখা গিয়েছে। জন কয়েক সমাজ-বিরোধী গুণ্ডাশ্রেণীর যুবকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই যুবকদের যখন তখন তাঁর তথাকথিত 'চেম্বারে' হাজির হতে দেখা যায় এবং তিনি নাকি তাদের প্রচুর আদর-আপ্যায়ন করে থাকেন। এই অসম আঁতাতে কোন্ পক্ষের ভূমিকা বেশি যদিও জানা যায় নি কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় এটিকে অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন। আমরা মহামান্য সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

সুভ্রাট আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। একই স্কুলে সেই নিচের ক্লাস থেকে সুরু করে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে পড়েছি, একসঙ্গে খেলেছি একসঙ্গে বেড়িয়েছি, তর্কাতর্কি করেছি, সময় বিশেষে ঝগড়াও যে করিনি তা নয়; কিন্তু ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব চিরদিনই অটুট ছিল। অসম্ভব বুদ্ধিমান আর অসম্ভব তুখোড় ছেলে। তেমনি অসম্ভব খামখেয়ালীও বলা চলে; সেই ছেলেবেলা থেকেই ওর ছোট্ট মাথায় যে কত রকম উদ্ভট কল্পনা, কত রকম উদ্ভট প্ল্যান আর কত রকম উদ্ভট চিন্তা গিজগিজ করত তা নিয়ে আমরা কত হাসাহাসিই না করেছি! কিন্তু ও তাতে ভ্রূক্ষেপ করাও দরকার মনে করত না।

তারপর ম্যাট্রিক পাশ করলাম, কলেজে উঠলাম। আই. এস্. সি. পাশ করে ও ডাক্তারী পড়ার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হ'ল, আমি আই. এ. পাশ করে ভালো করে পড়াশোনা করব ভেবে চলে গেলাম লখ্নৌ। সেখানে আমার মামা ইতিহাসের অধ্যাপক। ঐতিহাসিক হবার সাধ আমারও।

দেখাসাক্ষাৎ কমে এল। তারপর ডাক্তারী পাশ করে ও চলে গেল বিলেতে, আমি ইতিহাসের একটা অধ্যাপকের কাজ জুটিয়ে নিয়ে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত মহিমা খুঁজে বার করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। ভাঙ্গা মূর্তি আর শিলালিপির খোঁজে চষে বেড়াতে লাগলাম এখানে সেখানে। দেখা সাক্ষাতের আর ফুরসৎ রইল না।

দেখা হ'ল বহু বছর পরে। তখন আমরা দুজনেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে কিছুটা নাম করেছি। তবে সুভ্রাটের তুলনায় আমার নাম যে কিছুই নয় তা বুঝতে কষ্ট হ'ল না। সুভ্রাট তখন শহরের একজন প্রথম শ্রেণীর অস্ত্র-চিকিৎসক! লোকে বলত ও ছুরি ধরলে যমদূতরাও পালাতে পথ পায় না। কিন্তু হলে কি হবে, ওর সেই ছেলেবেলার খামখেয়ালিপনা মোটেই যায় নি, বরং বেড়েই চলছিল। অস্ত্র-চিকিৎসার নাম করে সে মাঝে মাঝে এমন সব বিপজ্জনক কাজ করে বসত যে রোগীর অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত। শেষে ওর নামে নানা অভিযোগ শোনা যেতে লাগল। ওর নাকি একটু একটু মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যাকে আমরা বলি মানসিক ভারসাম্য—তা নাকি ও ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে।

এরকম লোককে, আর যাই হোক, চিকিৎসার মতো জীবন-মরণ সমস্যার কাজে রাখা নিরাপদ নয়। কর্তৃপক্ষ তাই ওকে সরকারী কাজ থেকে

ইস্তফা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি সুরু করলেন এবং শেষে, তিতিবিরক্ত হয়ে, ওই একদিন ধুস্ বলে পদত্যাগ পত্র পেশ করে দিল।

এর মধ্যে ওর সঙ্গে দু-একবারের বেশি দেখা হয় নি। আজ কাগজ পড়ে ভাবলাম, সত্যি, ব্যাপারটা জেনে আসা উচিত। বাল্যবন্ধু হিশেবে আমারও কিছু কর্তব্য আছে তো!

বালীগঞ্জে সুভ্রাটের বিরাট বাড়ী। সামনের ঘরেই কাউন্টারের ভেতর নার্সের পোষাক পরা একটি মেয়ে বসে আছে। যেতেই সে একটা স্লিপ এগিয়ে দিল নামটা লিখে দেবার জন্য এবং নাম লেখা হলেই একটি খাকি জামা-পরা রোগা গোছের লোক সেটা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

মিনিট খানেক পরেই সে ফিরে এল। সাহেব ডাকছেন।

সুভ্রাটের ঘরে তখন দু-তিনটি তথাকথিত তরুণ বসে ছিল। তাদের চেহারা দেখেই মনে হ'ল তবে তো খবরের কাগজওয়ালারা বানিয়ে কিছু লেখেনি। তিনটি ছেলেই চেহারায়, পোষাক-আশাকে যাদের আমরা পাড়ার মাস্তান বলে থাকি—ঠিক তাই। তাদের সামনে খাবারের প্লেট সাজানো, পাশে চা-ভর্তি পেয়ালা। সুভ্রাট তাদের সঙ্গে যেমন গদগদ হাসিমুখে কথা বলছিল তাতে মনে হ'ল ওদের সঙ্গে তার ভারি খাতির।

ঢুকতেই, আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সুভ্রাট ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল, তারপর মাস্তানদের সঙ্গে ফের তার কথাবার্তা চলতে লাগল।

আমার ধৈর্য যখন প্রায় শেষ সীমায় তখন ছোকরা তিনটি উঠে পড়ল। সুভ্রাট উঠে দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এল।

এইবার সে আমার সঙ্গে কথা বলার ফুরসৎ পেল।

"তারপর? হঠাৎ তুই যে! কি মনে করে?"

"এলাম তোদের হালচাল দেখতে। কাগজে লিখেছে কিনা!"

"কাগজ!" —সুভ্রাট অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়ে তুলল।—

"নো ওয়ার্ক, ফ্রাই খই : নেই কাজ, খই ভাজ। খই-এর ইংরেজি কি রে? জানিনে বাবা!"

"হ্যাঁ, খই ভেজে যে অন্যায় করে নি তা তো দেখতেই পাচ্ছি। লোকে তোকে পাগলা ডাক্তার বলে, সেটা সহ্য করা যায়। কিন্তু তাই বলে তোকে এই সব মাস্তানদের সাকরেদ বলে ভাবা যায় না!"

সুভ্রাট কথার জবাব দিল না। মিটমিটি হাসতে হাসতে শুধু বলল, "চা খাবি?"

"না।"

"চা খাবি না? তবে কফিই আনতে বলি।"

আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই সে চাকরকে ডেকে দু'কাপ

কফি পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে বলল, "চল্, আমার চেম্বারে গিয়ে বসি।"

"চেম্বারে কেন ?'

'চল্ই না।"

চেম্বার দেখে মনে হ'ল ওটাকে চেম্বার না বলে কোনো আধুনিক বিজ্ঞানীর সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী বললেই ঠিক বলা হয়। চারদিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি সাজানো। দেয়ালে নানা রকম চার্ট, নক্শা ইত্যাদি ঝুলছে। একপাশে কতকগুলো শিশিবোতল, ইন্জেক্শনের সরঞ্জাম, আরও নানারকম সার্জারির অস্ত্রশস্ত্র। হ্যাঁ, অস্ত্রশস্ত্রই বলা চলে যন্ত্রপাতি না বলে। শুধু রোগের সঙ্গে নয়, রোগীর সঙ্গেও যুদ্ধ করা চলে ও দিয়ে।

একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্রও দেখলাম। অনেকটা মাইক্রোস্কোপ আর টেলিস্কোপের মাঝামাঝি দেখতে। ভারি কৌতূহল হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা আবার কি ?"

সুভ্রাট মুচকি হেসে বলল, "ফুটোস্কোপ।

"তার মানে ?"

'কেন, পড়িস নি সুকুমার রায়ের কবিতা ?

'আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে, দেখি কত ভেজালের মেকি আছে তোর মগজের ঘিয়ে।'

"তা তো পড়েছি, কিন্তু..."

"কিন্তু নয়, সত্যিই এটা ফুটোস্কোপ। এর সাহায্যে আমি মানুষের মাথার খুলির ভেতরটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাই। কোথায় আছে মোটর এরিয়া, যা নাকি সেরিব্রাম···বাংলায় যার নাম দেওয়া হয়েছে গুরু মস্তিষ্ক,—তার মাঝ বরাবর একটা সরু নালীর সামনে বসানো আছে, কোথায় আছে সেন্সরী এরিয়া যা নাকি আছে ওর পেছন দিকে। আর, তুই তো জানিস, আমাদের সব নার্ভ অর্থাৎ স্নায়ুর আসল কেন্দ্র হচ্ছে এই মস্তিষ্ক বা মগজ। আমাদের শরীরের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে দিচ্ছে এই মগজ।"

বাধা দিয়ে বললাম, "না রে বাবা, ও সবের কোন খবর টবর রাখি নে।"

"তা রাখবি কেন ? যত সব অকাজ নিয়ে পড়ে আছিস! সেই যে কবে কান্তকবি লিখে গিয়েছিলেন গৌতম সূত্রে আর রেশম সূত্রে প্রভেদ কি কি—তাই নিয়েই পড়ে থাক্। তারপর শিলালিপি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন দেখবি তুইও একটা জ্যান্ত পাথর হয়ে গেছিস। আজকের দিনের শেষ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান। কী অসম্ভব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে! কোথায় তা নিয়ে মাথা ঘামাবি, তা না যত্ত সব···"

আমি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, সুভ্রাট থামিয়ে দিয়ে বলল, "যা যা, মেলা বাজে বকিস না। নে, কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আগে খেয়ে নে। মগজটা তাজা তাজা লাগবে।"

কফি খেয়ে সত্যি মগজ না হলেও মেজাজটা একটু তাজা তাজা লাগছিল। বললাম, "এ অদ্ভুত যন্ত্র কোথায় পেলি ?"

"পেয়েছি কি আর ? মাথা খাটিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছি। দশ বছর লেগেছে এটি বার করতে।" বলেই সুভ্রাট আবার সুর করে আওড়াতে লাগল :

"কোন্ দিকে বুদ্ধিটা খেলে, কোন্ দিকে থেকে যায়, চাপা,
কতখানি ভস্ ভস ঘিলু, কতখানি ঠক্ঠকে ফাঁপা !"

নাঃ, আমার আবার মনে হ'ল কাগজওয়ালারা বাজে কথা লেখবার লোক নয়, এত বড় ডাক্তারটা সত্যি পাগলা হয়ে গেছে।

অগত্যা অন্য কথা পাড়লাম। বন্ধুবান্ধবদের কে কোথায় আছে, কে কি করছে—এই সব মামুলি গল্প সেরে খানিকক্ষণ বাদে উঠে এলাম।

কয়েকদিন পরে কাগজে আবার দেখি একটা জোর খবর। না, সুভ্রাট সম্বন্ধে নয়। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। খবরটা জো ডিম্বো সম্বন্ধে। জো ডিম্বো একজন নিগ্রো কুস্তিগীর। ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন না হলেও তারই সমগোত্রীয়। পৃথিবীর নানা দেশের কুস্তিগীরদের ঘায়েল করে সে নাকি এবার কলকাতায় আসছে। এদেশের বাঘা বাঘা কুস্তিগীরদের সঙ্গে লড়বে সে। লম্বায় সাত ফুট, ওজনে প্রায় পাঁচ মণ। অতিকায় এই নর-দানবটির ছবি দেখেছি. কিন্তু তার কুস্তি যে কখনও দেখার সুযোগ হবে তা ভাবি নি। নিজে কুস্তিগীর না হলেও কুস্তি আমার চিরদিনের প্রিয় খেলা। ছেলেবেলায় গামা, গুংগা, ইমাম বক্স, গোবর বাবু—এঁদের কুস্তি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ; সেই সূত্রে ওটা একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ইদানীং সে ধরণের বড় কোনও কুস্তিগীরের লড়াই দেখার সৌভাগ্য হয় নি। জো ডিম্বো আসছে শুনে তাই ঠিক করলাম, যে ভাবেই হোক ওর লড়াই দেখতেই হবে।

তবে শুনেছি লোকটা নাকি ভীষণ হিংস্র প্রকৃতির। কুস্তিটাকে খেলা হিশাবে ও দেখে না,—দেখে সত্যিকারের লড়াই,—যাকে আমরা বলি দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা ডুয়েল,…সেই চোখে, অর্থাৎ লড়াই-এর ফলে যদি বিপক্ষের প্রাণহানি ঘটে যায় তা হলেও কোনও পরোয়া করে না। একবার সত্যি তাই হয়েছিল। যার সঙ্গে ওর কুস্তি হ'ল লড়াই-এর আধ ঘন্টা পরেই সে মারা গেল। এ নিয়ে জো ডিম্বো একটু মুশ্কিলেই পড়েছিল। কিভাবে জানি না, শেষ পর্যন্ত মৃত লোকটির হার্ট খারাপ ছিল এই রকম

একটা, যাকে বলে 'বেনিফিট অব ডাউট'-এর অজুহাতে ও ছাড়া পায়। আর একবার কুস্তি লড়তে গিয়ে ও প্রতিদ্বন্দ্বীর চোখ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলেও শুনেছি। তা সত্ত্বেও জো ডিম্বোর লড়াই যে একটা দেখবার মত জিনিস হবে তাতে সন্দেহ নেই।

হু-হু করে টিকিট বিক্রি হতে লাগল। পাঁচ টাকা দশটাকার টিকিট লাইন দিয়ে এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আমি বহুকষ্টে পঁচিশ টাকা দিয়ে একটা দশ টাকার টিকিট যোগাড় করলাম—তাও খেলার এক সপ্তাহ আগে।

কিন্তু খেলার তিনদিন আগে আবার এক বিস্ময়কর খবর বেরোল, জো ডিম্বোকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কলকাতায় একটা নামী হোটেলে ও উঠেছিল এবং নিত্যকার অভ্যাসমত রাতে একটু বেশি মদটদ খেয়ে শুয়েছিল। হয়তো সেদিনকার মদের মাত্রাটা একটু বেশিই হয়ে থাকবে। ভোর রাত্রে উঠে দেখা গেল ওর ঘর খোলা। পালোয়ান বাবাজীর নো পাত্তা। কোথায় গেল? কোথায় গেল? খোঁজ খোঁজ খোঁজ। মদের ঝোঁকে কোথাও বেরিয়ে গেল? নাকি কেউ ওকে কিডন্যাপ—কিনা অপহরণ করল? কিন্তু অত বড় পালোয়ানটাকে কিডন্যাপ করা তো সহজ কথা নয়—যদি না লোকটা একদম বেহুঁশ হয়ে থাকে।

এদিকে খেলার টিকিট সমস্ত বিক্রি হয়ে গেছে। কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। পুলিশ চারদিক চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু না, কোন খোঁজ নেই জো ডিম্বোর।

অবশেষে খেলার নির্দিষ্ট দিন ভোর বেলা ওকে আবিষ্কার করা গেল। গঙ্গার ধারে একটা গাছের নিচে বসে আপন মনে চুরুট ফুঁকছিলেন বাবু! ওর ঐ মিশমিশে কালো অতিকায় চেহারা দেখেই লোকে সন্দেহ করেছিল। শেষে পুলিশে খবর দিতে তারা ছুটে এসে ওকে সনাক্ত করে গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে এল। আর আশ্চর্য, ও বেশ খোস-মেজাজে হাসতে হাসতেই তাদের সঙ্গে উঠে এল। সেদিনই সন্ধ্যায় ওর খেলা।

হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে আমিও বসে আছি। যথা সময়ে জো ডিম্বো মঞ্চে এসে ঢুকল। ওর সঙ্গে প্রথম লড়বে বেনারসের বিখ্যাত পালোয়ান শিউশরণ তেওয়ারী। মস্ত বড় নামী কুস্তিগীর। একটু থলথলে হলেও মোটামুটি বেশ মজবুত চেহারা। সমস্ত মাথা কামানো, শুধু মাঝখানে, ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপর একটিপ নস্যির মত ছোট্ট একটুকু চুলের আভাস। সেটি ওর টিকি, যা ওকে অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু সে টিকি ধরে কেউ টানবে এমন উপায় নেই।

কিন্তু জো ডিম্বোর চেহারা দেখে তাজ্জব বনে গেলাম। এতদিন শুনে এসেছি এই লোকটি শুধু চেহারায়ই কুৎসিত নয়,—স্বভাবেও অতি বদমেজাজী এবং তার চেয়েও বেশি হিংস্র। কিন্তু এখন দেখি একেবারে

উল্টো। না, চেহারা কুৎসিতই, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু মেজাজটা ভীষণ আমুদে। কথায় কথায় হেসে উঠছে, পারলে যেন গড়িয়ে পড়ে! শিউশরণকে মঞ্চে উঠতে দেখেই ও পরম আনন্দে এগিয়ে গিয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিল হ্যান্ড শেক্ করবার জন্য।

যথা সময়ে ঘণ্টা বাজল, হুইস্ল পড়ল শুরু হল কুস্তি। কিন্তু এ কি! কুস্তি লড়বে কে? জো ডিম্বো হেসেই কুল পায় না ফুর্তিতে এতই ডগোমগো! শিউশরণ যত তেড়ে আসে ও ততই পিছিয়ে যায় আর হাত নেড়ে এমন ভাব দেখায় যাকে পুঁথির ভাষায় বললে হয়তো বলা যায়—"না ভাই, আমাকে লড়তে ব'লো না। সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারব না। তার চেয়ে এস, দু'জনে গলাগলি করে বসে একটু রসের গান গাই।"

হাজার হাজার দর্শক দেখে সবাই থ।

এ অবস্থায় যা হবার তাই হল। শিউশরণ লড়বেই। জিতলে সে একটা খুব মোটা টাকা পাবে। তাই মিনিট খানেকের মধ্যেই সে জো ডিম্বোকে তুলে চিৎ করে দিল। অত বড় ভারী দেহটা তুলতে যতটা সময় লাগে ততটুকুই সময় লাগল তার। আর মজা, চিৎ হয়েও জো ডিম্বোর লজ্জা নেই। তখনও সে বোকার মতো ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

হঠাৎ একটু দূরে আর একটা অট্টহাসি শুনে চমকে ফিরে দেখি আমাদের অদূরে বসে আছে সুভদ্রাট! হেসে গড়িয়ে পড়ছে সেও। আর তার পাশে? সেই তিন মাস্তান। তারাও সমান হাসছে। সুভদ্রাটেরও তা হলে এ সব খেলা দেখার শখ আছে! কিন্তু সঙ্গে ঐ সব সঙ্গী কেন?

যাই হোক, মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম ঘটনা কখনও শোনা যায় নি। আমার না হয় পঁচিশটা টাকা জলে গেল, কিন্তু জো ডিম্বোকে যারা এনেছিল বহু টাকা খরচ করে তারা তো রাম খাপ্পা হবেই। সেই রাত্রেই তাকে দম্দম্ এয়ার পোর্টে নিয়ে গিয়ে প্লেনে রওনা করিয়ে দিয়ে আসা হ'ল! প্লেনে উঠেও নাকি জো ডিম্বোর মনে কোন রকম অনুশোচনা দেখা যায়নি, সে নাকি তেমনি ফুর্তির সঙ্গেই শিস দিতে দিতে গিয়ে বসেছিল তার সিটে।

এই ঘটনার পর মাস খানেক কেটে গেছে, লোকে আস্তে আস্তে সব ভুলে গেছে. এমন সময় আবার কাগজে দেখা গেল এক রগ্রগে বিজ্ঞাপন। কি, না কলম্বাস্ কলকাতায় আসছে। কে কলম্বাস? ইতিহাসের বিখ্যাত আবিষ্কারক ক্রিস্টোফর কলম্বাস? তিনি তো কয়েক শ' বছর আগের লোক! আরে না না, ক্রিস্টোফর নয়, গঞ্জালেস কলম্বাস—যে নাকি এখন স্পেনের সবচেয়ে নামকরা বুল্ ফাইটার।

বুল্ ফাইট্—ক্ষেপা ষাঁড়ের সামনে মানুষের একা দাঁড়িয়ে হাতাহাতি

লড়াই স্পেনের একটি জাতীয় খেলা—বহুদিন থেকে চলে আসছে এবং এখনও চলে।

বুল্ ফাইটের গল্প অনেক পড়েছি বইয়ে, কিন্তু এদেশে ও জিনিস কখনও চাক্ষুষ দেখি নি। কলম্বাস্ সেই খেলা দেখাবে কলকাতার স্টেডিয়ামে। সত্যি এটা একটা রগ্‌রগে খবরই বটে!

আবার সেই টিকিটের জন্যে লাইন। কিন্তু এবারে টিকিট যোগাড় করতে আরও কষ্ট হ'ল। অনেক ধরাধরি করে শেষে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে একটা কম দামী টিকিট যোগাড় হ'ল। তাই সই।

আশ্চর্য খেলা! কল্পনাই করা যায় না। স্টেডিয়ামের একদিকে একটা বিরাট ষাঁড় দাঁড়িয়ে। থেকে থেকে মাটিতে শিং ঘষছে আর নাক দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করছে। আমরা দূরে বসেও তা বেশ শুনতে পাচ্ছি। ষাঁড়-টার অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে কলম্বাস। তার কোমরের কাছে একটা টুকটুকে লাল তোয়ালে জড়ানো। একহাতে একটা চটের বস্তা, অন্য হাতে একটা বড় ছোরা।

শুনেছি লাল রং দেখলে গরু-মোষরা দারুণ ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রেও তাই দেখলাম। হঠাৎ ষাঁড়টা তীরবেগে ছুটে এসে আক্রমণ করল কলম্বাসকে। কলম্বাস চটের বস্তাটা ষাঁড়ের সামনে এগিয়ে দিয়ে চকিতে পাশে ঘুরে গেল। ষাঁড়টা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল মাটিতে। কিন্তু না, পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কলম্বাস কিন্তু এই ফাঁকে আবার অনেকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর ষাঁড়টার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বস্তাটা বাগিয়ে ধরে।

ষাঁড় আবার তেড়ে এল, আবার সেই রকম পাশ কাটিয়ে ওকে এড়িয়ে গেল কলম্বাস—চটের থলিটা এগিয়ে দিয়ে। আবার হুড়মুড় খেয়ে গড়িয়ে পড়ল ষাঁড়।

এই রকম চলল খানিকক্ষণ। মনে হল ষাঁড়টা এবার বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবু শেষ বারের মত সে আর একবার তেড়ে এল, কিন্তু এবার গতিতে ক্ষিপ্রতা যেন কম। কলম্বাস সে সুযোগ নিতে দেরি করল না। ষাঁড়টা চটের থলির উপর এসে পড়তেই সে খ্যাঁচ করে ছোরাটা তার পিঠে আমূল বসিয়ে দিল। ষাঁড়টা টলতে টলতে বসে পড়ল। তখনও মরে নি, রক্তের ধারা দেখে বোঝা গেল সে আর সহজে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

একটা পা শায়িত ষাঁড়ের গায়ে বাড়িয়ে দিয়ে কলম্বাস কোমরের লাল তোয়ালেটা খুলে নিশানের মত দোলাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চটাপট্ হাততালি আর বিপুল হর্ষধ্বনিতে সমস্ত স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ল।

চেঁচামেচি, হৈ-চৈ থামলে, সবাই অবাক্ হয়ে দেখে দর্শকের মধ্যে থেকে একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, স্বয়ং ডাক্তার সুভ্রাট চট্টখণ্ডী। এখানেও সে হাজির।

তারপর যা ঘটল তা অভাবনীয়। সমস্ত জনতাকে চমকিত করে সুভ্রাট ঘোষণা করল এ রকম বুল ফাইট সেও দেখাতে পারে। যে কোনো পাগলা ষাঁড়ের সঙ্গে সেও লড়তে প্রস্তুত। এবং আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এ খেলা সেও দেখাবে। এই স্টেডিয়ামেই !

যারা ওকে চিনত তারা হেসে উড়িয়ে দিল—পাগলা ডাক্তারের এ আর এক পাগলামি ভেবে। কিন্তু কলম্বাস গম্ভীর ভাবে বলল, "বেশ, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। যদি পারেন, আমার সমস্ত পারিশ্রমিকের টাকা ফেরত দিয়ে দেব।"

'বেশ, আমি আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। কোন্ ষাঁড়টার সঙ্গে লড়তে হবে আপনিই না হয় ঠিক করে দিন।"

একটা খোঁয়াড়ে অনেকগুলি অতিকায় জোয়ান ষাঁড় আটকানো ছিল। কলম্বাস এগিয়ে গিয়ে সবচেয়ে বদ্‌রাগী যেটা সেটাকে দেখিয়ে বলল, "এইটির সঙ্গে আপনি লড়বেন। কেবল ঐ ষাঁড়টিরই ঘাড়ের কাছে কালো ছাপ রয়েছে। কাজেই ওকে চিনে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।"

এক সপ্তাহ পরের কথা। স্টেডিয়াম সেদিন লোকে লোকারণ্য। আগের দিনের চেয়েও ভিড় বেশি। এবার আর আমি টিকিট সংগ্রহ করতে পারি নি। কিন্তু সুভ্রাটই একটা কম্‌প্লিমেণ্টারি টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে।

সন্ধ্যার দিকে সুভ্রাট সেজেগুজে ষ্টেডিয়ামে ঢুকল। ইচ্ছা করেই সে আজ একটা কোঁচানো ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে এসেছে। তবে কোমরে কলম্বাসের মতই একটা লাল তোয়ালে জড়িয়েছে—হয়তো ষাঁড়টাকে উত্তেজিত করার জন্য। তবে হাতে তার ছোরাটোরা কিছু নেই—আছে শুধু একটা ছোট চটের বস্তা। বাজার-করা থলির মতই ছোট সেটা। কলম্বাসের বস্তার চাইতে অনে-ক ছোট তো বটেই !

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছি। হ্যাঁ, সেই ঘাড়ের কাছে কালো ছাপ ষাঁড়টাই তো! সবচেয়ে বদ্‌মেজাজী বলে যেটাকে সবাই জানে—সেটাই তো রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে সুভ্রাটের মুখোমুখি।

কিন্তু কই, সুভ্রাটকে আক্রমণের জন্য তো তেড়ে আসছে না ষাঁড়টা ! বরঞ্চ সুভ্রাটই পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে !

একটু পরে আরও আশ্চর্য কাণ্ড ! সুভ্রাট বাঁ-হাতে চটের থলিটা পাশে ঝুলিয়ে রেখে ষাঁড়টার ঘাড়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে সুরু করল। আর ষাঁড়টা, গোঁয়াতুমি করা দূরে থাক, পোষা কুকুরের মত মাথা নিচু করে যেন ওর আদর কাড়তে লাগল !

সুভ্রাট চেঁচিয়ে বলল, "এই, লড়বি না ? আয় ! আয় !"

কিন্তু ষাঁড় নির্বিকার। কোথায় গেছে তার বদ্‌মেজাজ ! একেবারে

লজ্জানত নতুন বৌয়ের মতো মাথা নিচু করে সেই যে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই!

"দেখুন, ষাঁড় বলছে ও লড়াই করবে না। তার মানে ও স্বেচ্ছায় হার স্বীকার করে নিচ্ছে, তাই না? তা আমি আর কি করব?" —ষাঁড়ের গায়ে হেলান দিয়ে হাসতে হাসতে ঘোষণা করল সুভ্রাট। —"একটা বরঞ্চ ফটো তুলে নিন আপনারা। আর মিষ্টার কলম্বাস্! লড়াই যখন হ'লই না তখন আপনার পারিশ্রমিকের টাকা আর ফেরত দেবার প্রশ্নই উঠছে না। ও টাকা আপনারই প্রাপ্য, ও আপনি নিয়ে যান।"

ষ্টেডিয়াম শুদ্ধ লোক দেখেশুনে থ।

পরদিন ভোর না হতেই ছুটলাম সুভ্রাটের কাছে। এ অদ্ভুত রহস্যের সমাধান চাই-ই। আর, একমাত্র সুভ্রাটই হয়তো পারে তা করতে।

সুভ্রাট আজও সেই মাস্তানদের নিয়ে বসে বসে কফি খাচ্ছিল, হ্যাঁ, চেম্বারেই। আমায় দেখে আর এক পেয়ালার হুকুম দিয়ে বলল, "বোস্। জানতাম তুই আজ আসবি।"

ছোকরা তিনটি হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। —"আজ আসি তবে স্যার!"

"হ্যাঁ, এস।"

ওরা চলে গেলে আর ভণিতা না করে বললাম, "জানিস নিশ্চয়ই কেন এসেছি। বাজে কথা না বলে ভালো করে বুঝিয়ে দে তো রহস্যটা।"

সুভ্রাট সস্নেহে সেদিনকার সেই যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে বলল, "সব রহস্যের মূলে রয়েছে এই যন্ত্রটি—যার নাম আমি আদর করে দিয়েছি ফুটোস্কোপ। সব যন্ত্রপাতিরই ইংরেজি নাম হবে কেন, দু'একটার দিশী নামও থাকুক। বিশেষ করে অত বড় গুণী লোকের দেওয়া নাম!"

"তার মানে? ও সব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বলবি কি-না বল্!"

"বলব বইকি! আগে একটু জিরিয়ে নে। বড্ড উত্তেজিত মনে হচ্ছে তোকে।"

"না, আমার সবুর সইছে না।"

"আচ্ছ, আচ্ছা বলছি। তবে সংক্ষেপে বলব কিন্তু।"

তার পর সুভ্রাট সংক্ষেপেই সমস্ত ব্যাপারটা এইভাবে বুঝিয়ে দিল ঃ

"তুই হয়তো শুনে থাকবি, বহুদিন থেকে এই মগজ নিয়ে আমি রিসার্চ করছি। আমাদের শরীরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মগজ বা মস্তিষ্ক। আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র বলা যায় এটিকে। সেদিনই তোকে বলেছিলাম আমাদের দেহের কোথায় কি কাজ হবে, কি কাজ হচ্ছে এবং কি কাজ করতে হবে সবই ঠিক করে এই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের মধ্যে রয়েছে দু'টি ভাগ,—একটিকে বলা হয় সেরিব্রাম বা গুরুমস্তিষ্ক, আর একটিকে বলে সেরিবেলাম বা লঘুমস্তিষ্ক। গুরুমস্তিষ্কের পেছন দিকে

এমন এক-একটা জায়গা আছে যা আমাদের এক-একটা ইন্দ্রিয়ের কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, কোনটা নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দৃষ্টি, কোনটা শ্রবণশক্তি, কোনটা ঘ্রাণশক্তি, কোনটা বাক্‌শক্তি—এইরকম আর কি! ঐ রকম আমাদের ক্রোধ, হিংসা, আনন্দ, মনের স্ফূর্তি, স্মৃতিশক্তি—এ সবও কি মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রিত করে না? নিশ্চয়ই করে এবং তাদের জন্যও গুরু-মস্তিষ্কে এক-একটা নির্দিষ্ট জায়গা বাছাই করা আছে।

"মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করতে করতে আমার মনে হয়েছিল যদি ঐ জায়গাগুলোকে ঠিক ঠিক খুঁজে বার করতে পারি তা হলে ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে এক-একটা জায়গাকে ইচ্ছেমত নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারলে তার কাজগুলোকেও সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে আমাদের ইচ্ছামত। এখানে আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছে এই যন্ত্রটি যার নাম আমি আদর করে রেখেছি 'ফুটোস্কোপ।' সুকুমার রায়ের ঐ কবিতাটা আমার খুব প্রিয় কিনা! বিলেতে থাকতে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু—ডক্‌টর কিউইউ, সে ছিল ইউনিভার্সিটির অপ্‌টিক্‌ ফিজিক্‌সের অধ্যাপক—এই যন্ত্র তৈরির কাজে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। যাই হোক, এই যন্ত্রের সাহায্যে মগজের ভিতরকার নানা অংশ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মতই খুব বড় করে দেখা যায়। (এখানে সুভ্রাট আমাকে নিকল্‌ প্রিজম্‌, ক্যাথোড টিউব, কন্‌-কেভ-কনভেক্‌স ইত্যাদি নানা রকম লেন্স এবং আরও কি কি সব বিদ্‌ঘুটে বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যা আমি বুঝি নি। কাজেই বোঝাবারও চেষ্টা করব না।)

"যাই হোক, এই ফুটোস্কোপ যন্ত্রটির সাহায্যে এবং ক্রমাগত পরীক্ষা করে করে আমি মস্তিষ্কের ঐ সব বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো মোটামুটি সনাক্ত করে ফেলেছি এবং কি ভাবে ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে ও সব জায়গাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় তাও বার করেছি।

"প্রথমে হাসপাতালে রোগীদের ওপর এই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে প্রকাশ না করায় কেউ আমার উদ্দেশ্য ধরতে পারে নি। ফলে 'পাগলা ডাক্তার' এই খেতাব নিয়ে আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হ'ল।

"কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়েও আমি চুপচাপ বসে থাকতে পারি নি। বাড়িতেই ল্যাবরেটরী গোছের বানিয়ে নিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজ আরও ভালো করে চালিয়ে যাচ্ছিলাম! কিন্তু সমস্যা হল পরীক্ষা করব কাদের ওপর? আমি তখন বেপরোয়া হয়ে গেছি। ভাবলাম, এমনিতে না পাওয়া যায়, কৌশলে, এমন কি দরকার হলে জোর করে লোক ধরে আনব—হ্যাঁ, পুলিশের ভাষায় যাকে বলে কিড্‌ন্যাপ করা।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "বলিস কি? ওযে মস্ত বড় ফৌজদারী অপরাধ!"

সুভ্রাট বলল, "জানি বই কি? কিন্তু বিজ্ঞানের পরীক্ষা আমার কাছে আরও বড়। বলেছি না, আমি এখন বেপরোয়া। পরীক্ষা

চালাবার জন্য লোক আমার চাই-ই। কিন্তু এ কাজ তো আমি নিজে করতে পারব না, তাই সাহায্য নিয়েছি পাড়ার যত উঠ্‌তি গুণ্ডা গোছের ছোকরাদের—যাদের তোরা বলিস মাস্তান। ওদের সঙ্গে ভাব করে, ওদের খাইয়ে দাইয়ে, দরকার মত হাত খরচের পয়সাকড়ি যুগিয়ে, ওদের আমি আপনার করে নিয়েছি। তারপর ওদেরই সাহায্যে শিকার ধরে ধরে নিজের পরীক্ষা চালাচ্ছি।

সুভ্রাট একটু থামল, তার পর যেন একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলল, "দেখ্ সোমনাথ, এই সুযোগে ওদেরকেও আমি বেশ ঘেঁটে দেখেছি। ওদের আমরা সমাজ বিরোধী, উঠ্‌তি-গুণ্ডা, মাস্তান অনেক কিছু বলি, কিন্তু ওদের মধ্যেও প্রাণ আছে সে পরিচয় আমি পেয়েছি। সমাজের বিমুখতার জন্যই আজ ওরা এমনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের ভালোবাসলে ওদের অভাব দূর করলে, সহানুভূতির সঙ্গে ওদের সঙ্গে মিশলে দেখবি, ওদের তোরা যতটা খারাপ মনে করিস তা ওরা নয়। বিপদে আপদে ওরাই এগিয়ে আসতে পারে—যা তথাকথিত ভালো ছেলেরা কখনোই পারে না। আমার এ সব পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হলে আমি ওদের নিয়ে কাজ শুরু করব—ওদের ঠিকমত মানুষ করার কাজ।

"যাই হোক, জো ডিম্বোকে মত্ত অবস্থায় কিড্‌ন্যাপ করে এনেছিল আমারই ছোকরারা। এবং আমার ল্যাবরেটরীতে বসে আমিই ওর মগজের ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করার জায়গাগুলি নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে আনন্দ আর স্ফূর্তির জায়গাগুলো যাতে বেশি কাজ করে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কাজেই জো ডিম্বো কুৎসিত করবে কি, ফূর্তির চোটে শিউশরণের সঙ্গে গলাগলি করার জন্যই ও তখন ক্ষেপে উঠেছে।

"এই পরীক্ষায় সফল হবার ফলেই আমি নিজে বুল্ ফাইটের মত অতবড় একটা বিপজ্জনক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি। যদিও জানতাম কোথাও সামান্য একটু হিশেবের ভুল হয়ে গেলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। এখানে আরও একটু অসুবিধা ছিল। মানুষকে যত সহজে কিড্‌ন্যাপ্ করা যায় অত বড় একটা ষাঁড়কে তো তা করা যায় না। এজন্য আমাকে নিজেকেই যেতে হয়েছিল ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে গ্যাস-মুখোস পরে রাতের অন্ধকারে। অবশ্য সেখানেও ঐ মাস্তান ছোকরাগুলিই ছিল আমার প্রধান সহায়। সেখানে দারোয়ান, পাহারাদার এবং ষাঁড়গুলোকে ঘুম পাড়ানী গ্যাস ছড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে অচৈতন্য করে তার পর ঐ বিশেষ ষাঁড়টির মগজের ক্রোধ আর হিংসার জায়গাগুলো নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিলাম ইন্‌জেক্‌শনের সাহায্যে যদিও এখানে জায়গাগুলো খুঁজে বার করতে বেশ মেহনত করতে হয়েছিল আর ওষুধের ডোজও দরকার হয়েছিল অনেক বেশি। কিন্তু আমার যে ভুল হয় নি তা তো স্বচক্ষেই দেখেছিস! ঐ দুর্দান্ত ক্ষেপা বদ্‌মেজাজী ষাঁড়টাও যেন মন্ত্রবলে শকুন্তলা নাটকের সেই আশ্রম মৃগের মত হয়ে পড়েছিল! তাই না?"

শুনতে শুনতে আমি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ঘোর ভাঙ্গল সুভ্রাটের অট্টহাসিতে।—"কি রে, তুইও যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলি! কফি যে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল! নাঃ তোর মগজেও এবার একটা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়ে দিতে হবে দেখছি অন্যমনস্ক ভাবটাকে তাজা করতে! দিবি নাকি মুণ্ডুটা ফুটোস্কোপের তলায়?"

আবার অট্টহাস্যে ঘর কাঁপিয়ে তুলল সুভ্রাট।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বইয়ের পোকা

বইয়ের পোকা খুঁজতে গিয়ে খোকা
এ-বই ও-বই নাড়লো সারাদিন
তবু মা যে বললো ওকে 'বোকা
ও-পোকাকে পাওয়ার আশা ক্ষীণ' —
ততক্ষণে বইয়ের পাহাড় জমে
বাপির ঘরের আলোও গেল কমে
তাই না দেখে ওপাশ থেকে বাপি
বললো, 'কে ও করছো দাপাদাপি'
খোকা বললো, 'খুঁজছি বইয়ের পোকা'—
বাপি তখন বললো তাকে, 'বোকা
জানো না কি বই নিয়ে কে থাকে
সাড়া দেয় না যতই লোকে ডাকে
তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এই যে আমি
আমিই পোকা, বইয়ের পোকা, কেউ দেয় না দাম-ই!'

ফুলের শহর কলকাতা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীতে কলকাতার বড় বদনাম। কারুর মতে কলকাতা মিছিল নগরী, কারুর মতে কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী। কেউ কেউ মনে করেন কলকাতার মতো নোংরা শহর পৃথিবীতে নেই। কলকাতার যত বদনাম সবই যে নিন্দুকের দেওয়া একথা ঠিক নয়। আমরা যারা কলকাতায় বারোমাস বাস করি তারা জানি নিন্দুকরা যা বলে তার কিছুটা সত্যি। আমাদের পাড়ায় একটা মেয়েদের স্কুল আছে সেখানে ইংরেজি বাংলা অঙ্ক ভূগোলের মতো কি করে গরুর গুঁতো থেকে বাঁচতে হয় সে শিক্ষাও দেওয়া হয়। কারণ আর কিছুই নয় স্কুলটার চারপাশে বহু গরু বিচরণ করে এবং ছোট হোক বড় হোক মেয়ে দেখলেই গুঁতোতে যায়। হয়তো গরুদের জন্য স্কুল নেই বলেই হিংসায় এরকম করে। তোমরা তো দেখেছোই ফুটপাথে সাবধানে না চললে গোবরে কিংবা গর্তে পা পড়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হতে পারে। তারপর ধরো বাস ট্রাম। চড়াই যায় না এত ভিড়। আমি টুম্পা বলে একটা ছোট মেয়েকে জানি যে তার বাবাকে সারাক্ষণ বোঝায় কি দরকার বাসে চড়ার ভগবান তো পা দিয়েছেন হাঁটতে পার না? একবার বাসে ভীড়ের মধ্যে ওর পা কে মাড়িয়ে দিয়েছিল তাই ও বাসকে ভালবাসে না।

এসব তো আমরা জানি। আমরা যারা কলকাতার লোক তারা কিন্তু এসব জেনেও কলকাতাকে খুউব ভালবাসি। পুজোর সময় যখন বাবা মার সঙ্গে বাইরে যাও কি মজা। ট্রেনে চড়া, বাইরে গিয়ে কত হৈ-হুল্লোড় করা। তবু যখন কলকাতা ফেরো দূর থেকে ট্রেনে বসেই হাওড়ার ব্রীজের চূড়ো দেখতে পাও তখন কী ভালই লাগে, তাই না? কলকাতা যে আমাদের শহর! এখানেই তো তোমাদের স্কুল, বন্ধুবান্ধব। বাড়ির মতো মিষ্টি আর কী আছে?

কলকাতা কিন্তু শুধু নোংরা শহর নয় শুধু ইঁট পাথরের শহর নয় কলকাতা ফুলেরও শহর। কি বিশ্বাস হল না তো? ফুল দেখতে গেলে তো কলকাতার বাইরে যেতে হয় তাই না? আসলে কিন্তু চোখ খোলা রাখলে

কলকাতায় বসেও অনেক অনেক ফুল দেখা যায়। কলকাতার রাস্তায় এখন অনেক গাছ কমে গেছে। ২০ বছর আগে ১৯৬০-এর এক বিকেলে আধঘণ্টার ঝড়ে দক্ষিণ কলকাতায় কয়েকশ গাছ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নইলে সেই যে ছড়ায় আছে না, 'আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে' সেইরকম দেবদারু আর অন্যান্য গাছের ছায়ায় ভরা ছিল রাসবিহারী এভিনিউ আর অন্যান্য রাস্তা।

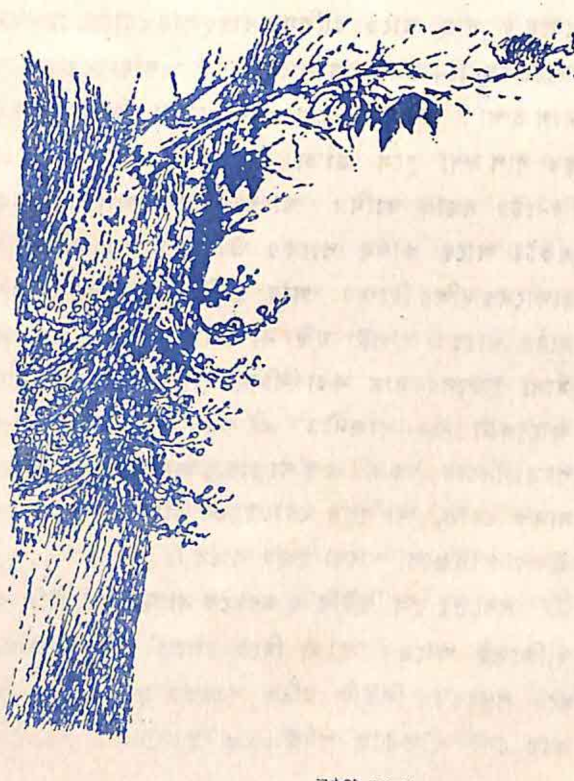
ফুল কিন্তু এখনও অনেক আছে। কলকাতায় ফুলের বাহারের সময় গরমকাল। এটা কিন্তু ভারি মজার, না ? কবিদের বর্ণনায় আছে বসন্তকাল হচ্ছে ফোটা ফুলের মেলা অথচ কলকাতায় যখন অসহ্য গরম তখনই ফুলের মেলা। রাস্তার ধারে যে গাছগুলো সারাবছর ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে থাকে হঠাৎ দেখি সে গাছটায় কি সুন্দর হলদে ফুল ফুটেছে। গাছটা হলুদ হয়ে গেছে। আর তার চাইতেও মজা গাছ থেকে টুপটাপ করে এই ফুলগুলো ঝরে পড়ে সারা গাছের তলাটাকেই হলুদ করে দিয়েছে। রামায়ণ মহাভারতে পড়েছো না যে দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন, যদি নিজের মাথার ওপর পুষ্পবৃষ্টি চাও তবে গাছের তলায় এসে দাঁড়িও। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথাটা ফুলের আশীর্বাদে ভরে যাবে। গাছটা কলকাতায় এতো আছে কিন্তু এর নামটা যে ঠিক কি, কেউ জানে না, কেউ বলে রাধাচূড়া, কেউ বলে বলরাম চূড়া। এর একটা খটমটো নাম আছে পেল্টোকোরাম ইনার্সে। কিন্তু ওসব নাম দিয়ে দরকার কী ? রাধাচূড়া অন্য আরেকটা ফুলকে বলে। ছোটগাছ, লাল ফুল হয়। বলরামচূড়া ঠিক নাম কি না বলতে পারব না। তার চাইতে ভাল নিজে নাম দেওয়া। তোমরা পছন্দ মতো নাম দিও।

এই যে গাছের নাম বলরাম কিংবা রাধা দিয়ে করার চেষ্টা, এর কারণ কিন্তু কৃষ্ণচূড়া। এই গাছ তোমরা সকলেই চেনো কলকাতার সব পাড়াতেই আছে। লাল ফুলে ভরা গাছটার দিকে তাকালে মনে হবে গাছের মাথায় আগুন ধরেছে। লালে লাল। বাঙালিরা নাম দিয়েছে কৃষ্ণচূড়া, অন্য রাজ্যে একে বলে গুলমোর।

বলরামচূড়া এবং কৃষ্ণচূড়া ছাড়া কলকাতায় গরমে আরো দুটো ফুল

আসর জাঁকিয়ে থাকে, একটি জারুল অন্যটি স্বর্ণমঞ্জরী। জারুল বেগুনি রঙের ফুল। ডাঁটি বেয়ে ওঠে। গাছগুলো বলরামচূড়ার মতো লম্বা হয় না। কিন্তু কী সুন্দর রঙ, চোখ জুড়িয়ে যায়। সোনার রঙের ফুল হয় স্বর্ণমঞ্জরী গাছে। থোকা থোকা ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে নেমে আসে। আঙুরের যেমন গুচ্ছ হয় তেমনি। যারা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব জিতলে ভীষণ লাফালাফি করে তারা একে বান্দর লড়ি-ও বলে। ফলগুলো লাঠির মতো হয়। বোধ হয় কেউ কখনো একটা বাঁদরকে লাঠি হিশাবে ব্যবহার করতে দেখেছিল। গরমকালে এই চারটে ফুল ছাড়া আরো কিছু ফুল ফোটে এদের বাঙলা নাম সব জানি না। তবে ইংরেজিতে এরা বিভিন্ন ধরণের একেশিয়া বলে পরিচিত। প্ল্যানেটেরিয়ামের রাস্তায় দেখবে কত রঙের একেশিয়া আছে।

বর্ষায়ও কলকাতায় ফুলের অভাব হয় না। সবচেয়ে বেশি ফোটে বকুল। লোকে বলে বকুল বসন্তের ফুল আমি কিন্তু একে বর্ষায়ই ফুটতে দেখি বেশি। বকুল গাছ কলকাতার প্রায় সব রাস্তায় আছে। সব সময় খুব বড়ো গাছ হয় না, কিন্তু অনেক সময়ই



নাগ চম্পা

প্রায় বটগাছের মতো লম্বা হয়। বকুল ছাড়া বর্ষাকালে যে ফুলটা ছোটদের গাছে ওঠার ইচ্ছা জাগায় সে হচ্ছে কদম। কদম ফুল গাছ ভরে ফুটে আছে দেখতে কী ভালই না লাগে। ন্যাড়া মাথায় হলদে সাদা খাড়া খাড়া পাপড়িতে ভরা গোল গোল ফুলগুলোর মিষ্টি গন্ধ। কিন্তু যেদিন ফোটে সেইদিনই পাড়ার ছেলেগুলো প্রায় গাছ মুড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়। কদম গাছ অতি সহনশীল; আবার পাতা গজায়, আবার ফুল ফোটায়। এ ছাড়া ফোটে শিরীষ। ছোট ছোট ঝিরঝিরে হলদে রঙের আর বেগুনি রঙের ফুল। আসলে এটা দুরকম গাছ। একটা শিরীষ যেটা বসন্ত কালে ফোটে, আরেকটার ইংরেজি নাম রেইন ট্রি। এই দ্বিতীয় গাছটাই কলকাতায় বেশি আছে। এর ফুলের রঙটা বেগুনি হাল্কা ধরণের। ফুল করে কানে পরলে মেয়েদের বোধহয় আরো সুন্দরী দেখায়। বর্ষাকালে ফোটে মেহেদি ফুল। মেহেদি গাছ আছে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে, যেখানে মিলিটারি ব্যারাক আছে সেখানে বর্ষাকালে আরো একটা অসাধারণ সুন্দর ফুল ফোটে। এর নাম নাগ চম্পা। ফুলটার মধ্যে এমন একটা কেশর আছে যেটাকে দেখলে মনে হয় সাপ ফণা তুলে ছাতা ধরেছে। এ গাছ খুব বেশি নেই। আমি তিনটের সন্ধান জানি। আরো নিশ্চয় আছে, তোমরা খোঁজ করো। একটা আছে কার্জন পার্কের উত্তর দিকে। একটা আছে হর্টিকালচার বাগানের দক্ষিণ দিকে। আর তৃতীয়টা রাসবিহারী এভিনিউতে মহানির্বাণ মঠের গায়ে। ফুলটা যদি না দেখে থাকো নিশ্চয় দেখো। বর্ষার ফুলের মধ্যে ফুরুসের নাম করা উচিত। ঝুরঝুরে নানা রঙের ফুল হয়। এ ফুলের আরেকটা নাম শাওনী। এই সময় ফুল আসে সেগুন গাছেও। সেগুনের পাতা বিরাট বড়। এক পাতায় দু'জন অনায়াসে ভাত খেতে পার। গুরু নানক রোড, আলিপুর রোডে এ গাছ অসংখ্য আছে। ফুলের বাহারে এ লম্বা গাছগুলো আরো সুন্দর লাগে।

শরতের ফুল শিউলি এ কথা কে না জানে, শিউলি কলকাতায় অনেকের বাড়িতেই আছে। রাস্তা দিয়ে চলতে গেলেই গন্ধ পাবে। পূজোর কথা মনে পড়বে। শিউলি যদিও শরতের ফুল— ফোটে কিন্তু জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু করে সেই শীতকাল পর্যন্ত। এ ছাড়া শেষ শরতে বা হেমন্তে ছাতিম।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ছাতিমতলার সম্পর্ক খুব নিবিড়। কিন্তু কলকাতায়ও অসংখ্য ছাতিম গাছ আছে। গোল করে সাতটা পাতা এক এক স্তবকে থাকে। সংস্কৃতে এর নাম তাই সপ্তপর্ণ। এর ফুল দেখতে কিছু আহামরি নয় তবে গন্ধ ভীষণ তীব্র। একবার ফুটলে বহুদূর পর্যন্ত গন্ধ পৌঁছে যাবে। সংস্কৃত কাব্যে আছে হাতিরা এর গন্ধে মাতাল হয়ে যায়।

শীতকালে কলকাতার রাস্তায় ফুল বিশেষ ফোটে না। এ সময় ফুলের শোভা বাড়ির টবে। হরেক রকম মরশুমি ফুল ফোটে। দালিয়া চন্দ্রমল্লিকা হচ্ছে তাদের মধ্যে সেরা। আমি বাড়ির ফুলের কথা আগে বলিনি, এ সুযোগে বলে নিই। কলকাতার বিভিন্ন বাড়িতে অনেক রকম ফুল ফোটে—রক্তকরবী, শ্বেতকরবী, গন্ধরাজ, জুঁই, বেল, গুলঞ্চ চাঁপা, টগর, সন্ধ্যামণি, অতসী, রঙ্গন, কল্কে, বোগেনভেলিয়া, মাধবী, মালতী, ঝুমকোলতা, তরুলতা। কলকাতার বহুলোক টবে এসব ফুল ফোটায়, গেটের ধারে তুলে দেয় লতা। যখন যেখানে এমন ফুল দেখবে যার নাম তুমি জান না, জেনে নেবে। পরীক্ষায় কোনো কাজে আসবে না কিন্তু দেখবে কি আনন্দ লুকিয়ে আছে সেই জানার মধ্যে। ক্যাকটাস্‌ও বহু বাড়িতে আছে! আমি কয়েকবার কার্জন পার্কে অসাধারণ সুন্দর ফুল ফুটতে দেখেছি ক্যাকটাসের। শীতের পর বসন্ত। কবিদের মতে ফুলের সময়। কলকাতায় এ সময় গাছে নূতন পাতা আসে। কচি সবুজের রঙ দেখলে মনে হবে বুঝি ফুল ফুটেছে। প্রথমেই আসে আম্রমঞ্জরী। আমের আর পেয়ারার ফুল ভারী সুন্দর। আমি প্রত্যেক বছর নজর রাখি কোন তারিখে প্রথম আমের মউল দেখতে পেলাম। কলকাতার বাইরে এ সময় সজনে ফুলও ফোটে। 'সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী', রবিঠাকুরের এই লাইনটার মতোই সুন্দর সজনে ফুলের গাছ। একদম দক্ষিণের কারুর কারুর পুরাতন বাড়িতে সজনে ফুলের গাছ কলকাতায়ও দেখতে পাবে। নিম গাছও এ সময়ে ফুলে ভর্তি থাকে এছাড়া রয়েছে শিমুল। টকটকে লাল ফুল ফুটে থাকে গাছে। এ গাছটার একটা মজা আছে। এ গাছে যখন ফুল ফোটে তখন গাছে একটাও পাতা থাকে না। ন্যাড়া গাছে লাল ফুল দেখতে পাবে। এ গাছ কলকাতায় আমি দেখেছি যাদুঘরের দক্ষিণ পশ্চিম

কোণে। আরো আছে নিশ্চয়, খুঁজে দেখো। কাঞ্চন গাছ চেনো। এর পাতা প্রজাপতির মতো দেখতে, জোড়া জোড়া পাতা। অনেক রকম রঙের ফুল হয়। সাদা আর বেগুনিই বেশি। মুচকুন্দ বা কনকচাঁপাও এ সময় ফোটে। এ গাছ খুব লম্বা হয়। আর পাতার রঙ একদিকে ঘন সবুজ আরেক দিক সাদাটে। মনে হবে একই গাছে দু'রঙের পাতা। ফুলগুলি হয় লম্বা লম্বা। কলকাতায় পলাশও ফোটে। লাল হলুদ আর কালোয় মিলে অসাধারণ সুন্দর। এই ফুলের গাছ আছে ন্যাশনাল লাইব্রেরি চত্বরে। ওই একই জায়গায় আছে অশোক ফুলের গাছ।

কলকাতায় যে ক'টা ফুলগাছের খবর দিলাম তাছাড়াও আরো বহু গাছ আছে। আমি সব গাছ চিনি না, কিছু বাদও পড়ে গিয়েছে হয়তো। কলকাতার পথে চলবার সময় চোখ খুলে চলবে দেখবে কতো সুন্দর জিনিষ চোখে পড়েনি। তোমরা তো চিড়িয়াখানা যাও প্রায়ই। এরপর যখন যাবে সাদা বাঘ, বাঁদর, হাতি, ক্যাঙারু, বনমানুষ, বাঘ, সিংহ—এসব দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার গাছগুলোও একটু দেখো। এত দুষ্প্রাপ্য গাছ কলকাতায় আর কোথাও নেই। চিড়িয়াখানায় গাছের নাম দেওয়া আছে গাছের গায়ে, ওখানেই আমি ব্রউনিয়া গাছ দেখেছি। অর্জুন গাছ দেখেছি। আর সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি আফ্রিকার বাওয়াব গাছ দেখে। 'চাঁদের পাহাড়' বইয়ে বিভূতিভূষণ এ গাছের বর্ণনা দিয়েছেন। হঠাৎ যেদিন চিড়িয়াখানার চত্বরে গাছটি আবিষ্কার করি সেদিন প্রায় কলম্বাসের মতো আনন্দ হয়েছিল। সেখানে পারুল গাছ দেখেছি। কখনো ফুল দেখিনি। গাছটা আছে ছোটদের পার্কের ধারে। হর্টিকালচার গার্ডেন আর লেকের মধ্যেও অনেক গাছ আছে।

লেকের গাছের মধ্যে সবচেয়ে ভাল গাছ আকাশমনি কিংবা সোনাঝুরি। এর ফলগুলির মধ্যে একটু কাজু বাদামের ভাব আছে। তোমরা এগুলি হাতে নিয়ে ঘষলে সাবানের মতো ফেনা হবে। সোনালী ফুল হয় এই গাছে।

তোমাদের তো অনেক বন্ধু আছে। বন্ধুদের জন্যই তো কলকাতা

ভাল লাগে তাই না? আমি তোমাদের এক নতুন বন্ধুর খবর দিলাম। গাছের সঙ্গে ভাব কোরো, গাছ ভীষণ ভাল বন্ধু। আড়ি করে না, আলুকাবলিতে ভাগ বসায় না। গাছ শুধুই আনন্দ দেয়। বন্ধু হিসাবে গাছের তুলনা নেই।

ডাব্বুর ভাবনা

গীতা দাশগুপ্ত

বড়দের মতন এমন অদ্ভুত আর কাউকে দেখিনি, নিজেরাই এতো এলোমেলো কথা বলবে অথচ আমায় বলবে, নাঃ এটাকে আর মানুষ করা গেল না।

আমি—হ্যা—আমি—আমার নাম কৌশিকনারায়ণ চৌধুরী. আমার বয়স সাত, আমার দাদাভাইয়ের নাম কৌস্তভ নারায়ণ চৌধুরী। ডিক্সনারি দেখে দাদু নাকি সাতদিন ভেবে ভেবে আমাদের নাম রেখেছিলেন। অথচ দাদাকে ডাকবে বুবু আমাকে ডাকবে ডাব্বু বলে। তাহলে আর ডিক্সনারি দেখে নাম রেখেছিলে কেন?

তাতেও হয় না—ছোটকা বলবে বিচ্ছু, ছোট পিসি আবার আরও উপরে, ডাকবে আমায় ন্যাড়া বলে।

আমি কেন ন্যাড়া হব। আমার মাথায় কি টাক না চুল নেই? নিজেই ঢাউস খোঁপা বাঁধবে বলে ফল্‌স-এর উপরে ফল্‌স লাগায় অথচ আমায় বলে ন্যাড়া।

এদের কাণ্ডই এরকম। ছোটকা সেদিন টেবিলের উপরে তাঁর কলম রেখেছিলেন। এসে বললেন—অ্যাঃ এটার দফা রফা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ডাক—ডাব্বু—ডাব্বু কলম নিয়ে লিখেছিলে?

শোন কথা, কলম দিয়ে লিখবো নাতো কি করবো, একি দেয়ালে রং করবার অস্তর যে রং করব। না এসব কথা এদের বললে চলবে না।

চোখ পাকিয়ে ছোটকা আবার চ্যাচাল—কলমটা নষ্ট করল কে ? ঘরে কে এসেছিল ?

বললাম, সেই বড় হুলো বেড়ালটা এসেছিল ছোটকা।



—ফের মিথ্যে কথা, কলমটা নষ্ট করে আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে—ঠাঁই ঠাঁই মাথায় গাট্টা বসিয়ে দিল ছোটকা—আর মিথ্যে কথা বলবি ? তোকে না জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প বলেছিলাম, কী বলেছিলাম, সব সময় সত্যি কথা বলবি, ভুলে গেছিস ?

—না—

—কখনও মিথ্যে বলবি না, যা এখন।

একটু পরে খট্খট কড়া নাড়ায় পাশের বাড়ির লবঙ্গবাবু, আমি যেতেই বললেন ডাব্বু, তোমার ছোটকা আছে ? ডেকে দাওতো।

ছোটকাকে বললাম, লবঙ্গবাবু এসেছেন। শুনেই ছোটকা বললে—এ্যাই মেরেছে, কবিতা না ছাই কি যে মাথামুণ্ডু লেখে তাই শুনতে হবে, যা বসতে বলগে।

আমি লবঙ্গবাবুকে বললাম, আসুন। একগাল হেসে সোফায় পা মুড়ে লবঙ্গবাবু বললেন, তোমার ছোটকা কোথায় ? কী বললেন ?

—বললেন, এ্যাই মেরেছে কবিতা না মাথামুণ্ডু লেখে তাই শুনতে হবে— ওমা দেখি আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছোটকা— চোখ দুটো গোল গোল করে তাকিয়ে আছে। আমি এক দৌড়ে দাদাভাইয়ের পড়ার ঘরে আসি।

দেখি ছোটপিসি আর দিদিভাই খিক্‌খিক্ করে হাসছে। দাদাভাই

আসতেই পিসি বলল, ওরে বুবু আজ যা মজা হয়েছে না, তোমার ভাইয়ের কপালে ছোড়দার গাট্টা।

কেনরে পিসি, কী হয়েছে? দাদাভাই জিজ্ঞেস করে।

লবঙ্গবাবু এসেছেন আর বিচ্ছুটা বলেছে, ছোটপিসি আমার মতন গলা করে বলল, কবিতা না ছাই মাথামুণ্ডু লেখে, আর অমনি ছোড়দা ওঘরে গিয়েছে।

হো হো করে তিনজনের কী হাসি।

আমি বললাম, বারে, আমি কী বলব? ছোটকাইতো বললে, সব সময় সত্যি কথা বলবি, আবার গাট্টা মারবে কেন?

দাদাভাই আমায় কোলে তুলে নিয়ে বলল—ডাব্বু সোনা সব সময় সত্যি কথা বললে হয় না, একটু একটু মিথ্যেও বলতে হয় বুঝেছ।

—মাথা নাড়াই—

কী বলবে?

মিথ্যে কথা।

কেমন করে বলবে?

কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, তোমরা কলেজে না গিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে।

দাদাভাই মাথা নাড়ায়, বাঃ বাঃ বেশতো ঘিলু আছে।

এর মধ্যে কখন যে বড়মা এসেছেন আমরা দেখিনি। এসেই চ্যাঁচাতে শুরু করেছেন, কলেজে না গিয়ে সিনেমায় যাওয়া হয়েছিল? তাইতো বলি প্রত্যেক দিন ছেলের এসে খাই খাই, খেতে দেবার সবুর সয় না—আজ ডাকছি আসছে না কেন?

বারে আমি আবার সিনেমা কখন গেলাম? দাদা প্রতিবাদ করে।

বড়মা বকেই চলেছেন, পড়াশুনার নাম নেই, খালি আড্ডা আর আড্ডা, আবার কলেজ পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া হয়েছিল, আসুক তোমার বাবা—।

না—না—বুবুতো যায়নি—

থাম তুই, ছোটপিসিকে এক ধমকে থামিয়ে দেন বড়মা, তুইও গিয়েছিলি ওর সঙ্গে ?

বা-রে, আমি কেন যাব ? আমি তো কলেজ থেকে সোজা আসছি—ছোটপিসি বলল।

তোর আসকারাতেই বুবুটা গোল্লায় গেলো। শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে জুটেছে। পিসি হয়ে নিজেই যদি পড়াশুনো না করবে ছোটরা শিখবে কী—বড়মা গজ্‌গজ্‌ করতে করতে চলে যান।

—বজ্জাত বিচ্ছু—হাড় জালিয়ে খেল, ঠাঁই ঠাঁই ছোটপিসি আমাকে চড় কষায়।

এদের রকমটাই এই। নিজেদের কথাবার্তার কিছু ঠিক নেই। শুধু আমায় বলবে। এই আজকের ব্যাপারটাই ধর না—।

নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িশুদ্ধ লোকের যে কী হয়ে যায় এরাই জানে। বাবা চেঁচাবেন, দেরী হয়ে গেল, অফিসের দেরী হয়ে গেল। রান্নাঘরে ঘুড়ির আঠার জন্য যদি যাও সবাই চেঁচাচ্ছে, এখন না, এখন না, এখন অফিসের ভাত দিতে হবে। অথচ যশোদা ঝি যত বাটনা বাঁটছে তার চেয়ে বেশি চ্যাঁচাচ্ছে, বামুন ঠাকরুন যত খুন্তি নাড়ছে তার চেয়ে বেশি বক্‌বক্‌ করছে।

বড়মা একবার দোতলায় উঠছেন, মা একতলায় নামছে— কী এদের কাজরে বাবা।

যাক্‌গে ঠাম্মুর কাছে যাই। সত্যি কথা বলতে কি বাড়ীতে ঠাম্মুই যত্ন আত্তি করে নাড়ুটা কলাটা আমায় দেয়। গোপাল গোপাল বলে কত আদর করে। এতক্ষণে ঠাম্মুর চান পূজো সব হয়ে গিয়েছে। পেসাদটা খেয়ে আসি নইলে দিদিভাইটা ভাগ বসাবে, ওটা কি কম হ্যাংলা ?

তেতালায় ঠাম্মুর ঘর ! দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ঠাম্মু, ঠাম্মু তোমার পূজো হয়নি ?

ঠাম্মু বললে, আর পূজো, চানটাই হল না।

চান করনি ? কেন ?

করব কী দিয়ে? ডেরামে কী জল আছে? যশিকে বল্লুম জল দিয়ে যা, জল দিয়ে যা, মুখপুড়ির এখনও সময় হল না— ঠাম্মু রেগে যান।

ও হরি, তোমাদের বলিনি, সকালবেলা আমি ছাদে এসে ঠাম্মুর জলের ড্রামের কলটা খুলে দিয়েছিলাম। তারপরে কাকগুলো যেখানে বসেছিল, কলের সঙ্গে হাত জুড়ে হোস পাইপের মতো করে জল ছিটিয়ে ছিলাম। আর অমনি কলটা খুলে গেল। আমি লাগাতে গেলাম কিছুতেই লাগল না। আমি কী করব বল, কলওয়ালাটা একদম বাজে জিনিষ দিয়েছে— সাধে কি জেঠু বলে, সারা দেশটা চোরজোচ্চরে ভরে গেল। ভাবলাম কলটা দাদা-ভাইকে দেব ঠিক করে দেবে, এইতো পকেটে আছে। আচ্ছা আমি না হয় ভুলে গেছি, কিন্তু তোমরা, তোমরা কি দেখবে না ঠাম্মুর ড্রামে জল নেই। বললাম, কাউকে বলনি ঠাম্মু?

ঠাম্মু আরও রেগে যায়, কতবার বলব? আমি কি বারে বারে উপর নিচে করতে পারি?

পিসিকে বলনি?

আর পিসি? বাড়ি শুদ্ধু কারো কি খেয়াল আছে আমার দিকে? আমারই ঘরবাড়ি, আমারই সংসার, ছেলেবৌ। সব যে যার নিজের তালে আছে, আমাকে নেব্বাসনে দিয়েছে।

ঠাম্মুকে নেব্বাসনে দিয়েছে। সীতাদেবীকে নেব্বাসন দিয়েছিল, বড়রাণী সুনীতিকেও। ঠাম্মুর মুখটা দেখি—উহুঁ, সীতাদেবীর মতন নয়, বড়রাণী সুনীতির মতোও নয়। ঠাম্মুর মুখ ঠাম্মুর মতন, গোল গোল ফর্সা।

কী অত দেখছ দাদুভাই, ঠাম্মু জিজ্ঞেস করে।

কে তোমায় নেব্বাসন দিল ঠাম্মু, জিজ্ঞেস করি।

কপাল, আমার কপাল, ঠাম্মু বলল।

ছুটে একতলায় জেঠুর ঘরে চলে আসি। জেঠু তখন কোর্ট থেকে ফিরে মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে ডাকে—ডাব্বু সোনা। মনে হয় যেন রাজা দশরথ বর দিচ্ছে। তবে কি দশরথই নেব্বাসন দিয়েছে। জিজ্ঞেস করি, জেঠু, ঠাম্মুকে নেব্বাসন দিয়েছে কে?

কী বললি ? জেঠু চশমা নাকের উপরে তুলে নেয়।

—ঠাম্মু যে বলল আমায় কেউ দেখে না, নেব্বাসন দিয়েছে।

জেঠু হুংকার ছাড়ে—স- বিতা, স- বিতা।

ছোট পিসি ভয়ে জড়সড় হয়ে আসে, আমায় ডাকছ বড়দা। চিৎকার করে জেঠু, তোরা সব করিস কী? মার কী লাগবে না লাগবে দেখতে পারিস না? বলেই চটি ফট্‌র ফট্‌র করে ভেতরে চলে আসেন।

মা আমার কান ধরে টেনে দুটো থাপ্‌পর কষিয়ে দেয়—আবার কী লাগিয়েছিস দাদার কাছে? বল কী বলেছিস?

ঠিক সেই সময় জেঠু ঘর থেকে ফিরছিলেন, চেঁচিয়ে ওঠেন, আশ্চর্য একবাড়ি লোক কাজের বেলা কেউ নেই, সবাই পারে শুধু একটা বাচ্চা-ছেলেকে ঠ্যাঙাতে।

মা আমাকে ছেড়ে ঘরে গিয়ে বসলেন। দিদিভাই ইস্কুলে যাবে বলে বেণী বাঁধছিল, জেঠুর সামনে পড়ে যায়। জেঠু জিজ্ঞেস করেন,—কোথায় যাচ্ছ?

—ইস্কুলে—

ইস্কুলে যাচ্ছ, সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়ান, খুব শিক্ষে হচ্ছে তোমার! বকুনি খেয়ে দিদিভাই ফোঁপাতে শুরু করল।

বাবা দালানে খেতে বসেছিলেন, বড়মা বাবার জন্য মাছের ঝোল আনছিলেন। বাবা জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে বৌদি, দাদা অত রাগারাগি করছে কেন?

বাবার পাতে মাছের ঝোল ঢেলে দেন বড়মা, বলেন ও কিছু না তুমি খাও। কিন্তু ততক্ষণে সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে যশোদার গলা—আমি বল্লুম কর্তামার জল তুলে দিয়ে আসি, বড়মা বল্লে আগে মাছ কুটে দে, মেজবাবুর অফিসের দেরি হয়ে যাবে। কোনদিকে যাব? কী বাড়িরে বাবা, চৌপর দিন খেটেও মরব আবার কথাও শুনব।

বাবা ভাতের থালা ছুঁড়ে উঠে যান। বড়মা ঘটাং করে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। মনে হল সারা বাড়িটা যেন কর্তালের মতন ঝম্‌ঝম্ করছে। মা ঘরে গিয়ে ফোঁপাচ্ছেন, দিদিভাইয়ের ইস্কুলের বাস

এসে ভ্যাক্‌ভ্যাক করে হর্ন বাজাচ্ছে, আর জেঠু চশমা এঁটে একরাশ কাগজের উপর মুখ দিয়ে রইল। আর সারা বাড়ি জুড়ে যশোদা দাপাদাপি করতে লাগল।

একটু পরে বামুনদি এসে হিড়হিড় করে আমাকে টেনে গায়ে জল দিয়ে খেতে বসিয়ে দিল, বলল, যা দেব চুপ করে খাবে। বিচ্ছু ছেলে, তোমার জন্য আজ বাড়ি শুদ্ধু কারো খাওয়া হয়নি।

বাড়ি শুদ্ধু তো কারো খাওয়া হয়নি, নিজে যে সরা চাপা দিয়ে এক গাদা মাছ রেখেছ, একটু পরে বোনপো এলে তাকে দিয়ে দেবে, তা বুঝি আমি দেখিনি। কিচ্ছু বললাম না, চুপ করে খেয়ে উঠে এলাম।

ভ্যাক্‌ করে একটা টাক্‌সি থামল। দেখি ছোটকা বড়পিসিকে নিয়ে এসেছে। বড়পিসি এল, বড়মার দরজা খুলল, দিদিভাইয়ের কান্না থামল, ঠাম্মু সরবৎ মিষ্টি খেল। এসব যখন হল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বড়পিসি আমাকে ডেকে বললেন, ডাব্বু ডাব্বু সোনা, তুমি লক্ষী ছেলে ভাল ছেলে তাই না? তুমি আর বড়দের কথার মধ্যে থাকবে না, শুনবেও না—বুঝলে!

আমি মাথা নাড়ালাম।

তোমাদের কথার মধ্যে কেই বা থাকতে চাচ্ছে কেই বা শুনতে চাইছে। এই যে দাদাভাইকে দিয়ে এক চ্যাঙ্গাড়ি হিংয়ের কচুরি এনেছ, বাড়িতে জামাই এসেছে বলে ঠাম্মু যশোদাকে দিয়ে কড়াপাকের সন্দেশ আনিয়েছে, সবতো টেবিলে ডাঁইডাঁই করে সাজিয়ে রেখেছ—। আমি কি কিছু বলতে গেছি। আমি তো দালানের এককোণে বসে সিগারেটের রাংতা নিয়ে খেলছি। (বাড়ি শুধু আমি একাই নোংরা করি, পিসেমশাই যে সিগারেটের প্যাকেট ফেলেছে!) এই রাংতা পাখি, যা—যা পাখি উড়ে যা, না—না, হেলিকপ্‌টার, গোঁ গোঁ উঠছে উঠছে। আর একটা এরোপ্লেন আসছে, ফাইট হবে ফাইট।

এই যা বড়দা নিচে, বুবু যা তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়—বড়পিসি বললেন।

ওরে বাব্বা আমি পারব না, দাদাভাই বড় একটা কচুরিতে কামড় দেয়। ছোটকা বললেন, বিচ্ছু, জেঠুকে ডেকে নিয়ে আয়।

ডাব্বু সোনা, যাও, বড়দাকে ডেকে নিয়ে এস, পিসেমশাই বলেন।

ফাইট্ হচ্ছে ফাইট। মেশিনগানের গুলি ছুটছে কট্ কট্ কট্—গ্যাট্ গ্যাট্, আমার মাথায় গাঁট্টা মারে ছোটপিসি, কানে কথা যায়নি? বড়দের কথা শুনতে পার না, না? যা জেঠুকে ডেকে নিয়ে আয়।

আচ্ছা তোমরাই বল, এদের নিয়ে আমি কী করব! বড়পিসি বললেন, বড়দের কথা শুনবে না; ছোটপিসি গাঁট্টা মারল, বড়দের কথা কেন শুনিস না বলে। এদের নিয়ে কি পারা যায়?

কুমিরকে বাঁচাও

সংকর্ষণ রায়

পৃথিবী থেকে কুমির খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আফ্রিকার নাইজেরিয়ার নাইজার নদীর জলা আগে কুমিরে ভরা ছিল—এখন জলার মধ্যে সবজির চাষ হচ্ছে, কাজেই কুমিরের সংখ্যা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের অঙ্কে এসে ঠেকেছে।

পৃথিবীশুদ্ধ দারুণ চাহিদা কুমিরের চামড়ার। প্যারিসে কুমিরের চামড়া দিয়ে তৈরী একটি চলমান পানশালার (Portable Bar) দাম প্রায় ষাট হাজার টাকা। চামড়ার লোভে ব্যাপকভাবে কুমির সংহারপর্ব চলেছে বিশ্বময়। উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার লিভারপুল নদীতে কুমির শিকারীরা দৈনিক প্রায় চল্লিশটা করে কুমির শিকার করছে।

কুমির ডাইনোসরের সগোত্র—কুড়ি কোটি বছর ধরে আছে পৃথিবীতে। তার সমসাময়িক অতিকায় সরীসৃপরা সব লোপ পেয়ে গেলেও বিবর্তনের প্রতিকূল শক্তি কুমীরকে স্পর্শও করতে পারেনি। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে,

কী প্রচণ্ড তার প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তি শুধু নয়, বুদ্ধিও আছে তার—তাদের মস্তিষ্কের আধার ডাইনোসরদের চেয়ে অনেক বড়। দৈনন্দিন জীবনধারণ এবং আত্মরক্ষার জন্য যা যা প্রয়োজন সব খুব দ্রুত শিখে নেয় তারা। তাদের হৃদযন্ত্র পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মতোই শক্তিশালী। প্রতিকূল পরিবেশ এবং হিংস্র প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করে কুড়ি কোটি বছর ধরে টিঁকে থাকা এই শক্তিশালী প্রাণী আজ মানুষের কাছে হার মানতে চলেছে। মানুষের মারণাস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তার নেই, কাজেই দ্রুত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। যে রকম ব্যাপকভাবে কুমির শিকার চলছে, কুড়ি কোটি বছরের প্রাচীন এই প্রাণীর ত্রিশ বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মোট একুশ রকম কুমির দেখা যায়। তাদের মধ্যে আছে চওড়া থেকে সরু রকমারি চোয়ালযুক্ত কুমির। আকারে তারা তিন থেকে তেত্রিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। বড়ো আকারের কুমিররা সাধারণত লোনা জলের মধ্যে বাস করে। কুমিরদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল। একমাত্র ভারতেই তাদের পাওয়া যায়। মালয়েশিয়াতে মেছো কুমিরের আকারের এক ধরণের কুমির দেখা যায়, তারা আসলে সাধারণ কুমিরেরই পর্যায়ে পড়ে।

কুমির নিঃশেষ হ'য়ে যাচ্ছে বলে জীববিজ্ঞানীরা যে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন, তাতে সাধারণ মানুষেরা সায় দেবে বলে মনে হয় না। কারণ কুমিরকে সকলে বিশ্রী রকম হিংস্র, কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর জানোয়ার বলেই জানে। নিঃশেষ হয়ে আসা কুমিরের জন্য খুব কম লোকই অশ্রুপাত করবে।

কিন্তু কুমিরকে কেউ ভাল না বাসলেও তার চামড়ার ওপরে লোভ আছে সকলেরই। কুমির ধ্বংস হলে তো আর তার চামড়া পাওয়া যাবে না, কাজেই অন্ততপক্ষে তার চামড়ার জন্য তাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, যেমন মাংস ও ডিমের জন্য পশুপাখিদের লালনপালন করা প্রয়োজন। মাছের চাষের মতো তাই কুমিরের চাষের প্রবর্তন দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বহু জায়গায়।

কুমিররা থাকে জলা জায়গায়, জল ও ডাঙ্গা উভয় ক্ষেত্রেই অবাধ

তাদের বিচরণ। তবে আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপন করে জলের মধ্যে। জলের মধ্যে ডুবে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করতে পারে তারা ঘন্টার পর ঘণ্টা। আহারের অন্বেষণ বাদ দিলে নিষ্ক্রিয়ভাবেই কাটে তাদের সমস্ত দিন। স্ত্রী কুমিরদের অবশ্য ডিম পাড়া, ডিম-ফোটানো এবং লালন-পালন আছে—তার কথা পরে বলছি।

জলের মধ্যে কুমিরের বাস, জলের মধ্যে বাসাও বাঁধে তারা। জলজ গাছপালা জড়ো করে পাখির বাসার অনুকরণে তারা বাসা তৈরি করে। কুমিররা সাধারণত দলবেঁধে থাকে। কোন কোন কুমির অবশ্য একা থাকতেই ভালবাসে। ডাঙ্গায় যখন থাকে, তখন তাদের চাপা তর্জন গর্জন হিস হিসানি শোনা যায়। পুরোপুরি নিঃশব্দেও অবশ্য তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান ঘটে। সেটা অবশ্য সম্ভব হয় জলের মধ্যে। জলের মধ্যে মানুষের শ্রবণের অতীত শব্দতরঙ্গ সঞ্চারে তারা সক্ষম—এ শব্দ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলাপ চালায় তারা। তা ছাড়া রকমারি অঙ্গভঙ্গির মধ্য দিয়েও তাদের কথাবার্তা চলে। সশব্দে, মানুষের শ্রবণের অতীত শব্দ সঞ্চার করে এবং অঙ্গভঙ্গীর মধ্য দিয়ে দিব্যি আড্ডা জমায় কুমিররা।

কুমিরদের আড্ডায় যোগ দেবার উৎসাহ নিশ্চয়ই অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার হবে না, কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা কুমিরদের ভালবাসেন এবং কাছের থেকে কুমিরদের আড্ডা মারতে দেখেছেন। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন শহরের দুশো মাইল পূর্বে মানিন্‌গ্রিডার জলাভূমিতে কুমিরদের আড্ডায় গিয়েছিলেন এমনি দুজন কুমির প্রেমিক জীববিজ্ঞানী, তাঁদের নাম রিক্ গোর এবং বিল ম্যাগনুসন। বিল ম্যাগনুসন এর আগে একবার এসেছিলেন কুমিরদের এই আড্ডাখানায়– তাঁর সঙ্গে ছিল ডিক ও অসকার নামে দুজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক। ডিক ও অস্‌কারই বিলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার পরই মারা যায় অসকার। স্থানীয় লোকেরা বিল-এর কাছে এসে বলে যে কুমিরদের আড্ডাখানার পবিত্রতা নষ্ট করা হয়েছে বলেই কুমিরদের দেবতা অস্‌কার-এর প্রাণ নিয়েছেন। কাজেই রিক্ ও বিল-এর সঙ্গে ডিক্ বা স্থানীয় আর কোন লোক যেতে রাজি হয় না। পথপ্রদর্শক না

থাকলেও অবশ্য ওদের কোন অসুবিধে হয় না, এর আগে মাত্র একবার এখানে এলেও বিল নির্ভুল পথে নিয়ে আসে রিক্‌কে।

বিল ও রিক্ পৌঁছে যায় ম্যানিন্‌গ্রিডায় কুমিরদের আড্ডায়। ইতস্তত চরে বেড়ানো কিছু কুমির চোখে পড়ে তাদের, বিল ও রিক্-এর উপস্থিতি তাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করে না। কিন্তু বাধা পায় একটি মা কুমিরের কাছে। সে তখন তার ডিমগুলোকে আগলাচ্ছিল। বিল ও রিক্ মোট ষাটটা ডিমের একটি স্তূপ দেখতে পায়। মা কুমিরটি এক মুহূর্তের জন্যও ডিমগুলোর কাছ থেকে সরে যায় না, কারণ ডাঙার বন্যপ্রাণিদের ভীষণ লোভ কুমিরের ডিমের ওপর।

মা-কুমিরের সঙ্গে তার সঙ্গী পুরুষ কুমিরটিও ডিমগুলিকে পাহারা দেয়। মা-কুমিরটি ডিমগুলো ছেড়ে নড়তে পারে না ব'লে পুরুষ কুমিরটি তার সঙ্গিনীর জন্য খাদ্য (ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি) এনে দেয়। পুরুষ কুমিরটির হাবভাবে রিক্ ও বিল-এর মনে হল সে এই জলার কুমিরদের অধিপতি। আকারে বিশাল—লম্বায় প্রায় কুড়ি ফুট হবে। দলের অন্যান্য কুমির যে তার বশ, তা তারা তাদের অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে সর্বদাই প্রকাশ করে থাকে। জলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে মাথা তুলে গলাকে অনাবৃত করা—এই ভাবেই তাদের বশ্যতা প্রকাশ করে তারা তাদের দলপতির কাছে।

কুমিরদের এই আডডায় রোজই যায় বিল ও রিক্। তাদের বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণে দলপতি কোন আপত্তি করে না—অন্যান্য কুমিররাও মেনে নেয় তাদের সান্নিধ্য।

বিল ও রিক্-এর উপস্থিতিকে মেনে নিলেও অন্যদলের একটি কুমিরের প্রতি হিংস্র হয়ে ওঠে দলপতি। প্রায় বারো ফুট লম্বা এই কুমিরটি বোধহয় পথ ভুলে চলে এসেছিল ম্যানিন্‌গ্রিডার এই জলায়। দলপতি তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করে তাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাবু করে মেরে ফেলে।

তারপর দলের সকলে মিলে খেয়ে ফেলে তার মাংস। মা-কুমিরটি তো তার ডিম ছেড়ে নড়বে না, কাজেই দলপতি ঐ মরা কুমিরের দেহের একটা বড়ো অংশ কেটে মা কুমিরের মুখের কাছে এনে দেয়।

এর কিছু দিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ষাটটা ডিমের প্রায় চল্লিশটা নষ্ট হয় এবং বাচ্চা বেরিয়ে আসে তাদের খোলস ছেড়ে। বাচ্চাদের জন্য জলের তলায় একটা নিরাপদ আস্তানা আগেভাগেই তৈরি করে রেখেছিল দলপতি। মা-কুমির তার সদ্য ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা বাচ্চা-গুলোকে মুখে করে নিয়ে যায় ওখানে। একসঙ্গে তিন চারটার বেশি বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়—কাজেই পুরুষ কুমিরটি মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। যতক্ষণ না সবকটা বাচ্চাকে মা-কুমির ঐ নিরাপদ আশ্রয়ে স্থানান্তর করতে পারছে, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে।

বাচ্চাগুলোকে নিরাপদ আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার পর একটানা দু মাস ধরে তাদের আগলে রাখে মা-কুমির। দু মাস বাদে যখন বাচ্চাগুলো মোটামুটি বড় হ'য়ে ওঠে, তখন শেষ হয় মা-কুমিরের কর্তব্য। তারপর আর তার মধ্যে মাতৃত্ব বা মাতৃস্নেহের ছিঁটেফোঁটাও দেখা যায় না।

স্বভাবে কুমিররা অবশ্যই হিংস্র—আহারের অন্বেষণ, আত্মরক্ষা, সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দলগত স্বার্থরক্ষার জন্য সত্যিই তাদের হিংস্রতার কোন তুলনা নেই। মানুষের মাংসের প্রতি তাদের আসক্তি-বাঘ-সিংহের চেয়েও বেশী, শিশুরা কুমিরদের আস্তানার কাছাকাছি গেলে তাদের আর রক্ষা নেই। সাধারণত লোনা জলের বড় কুমির, ইজিপ্টের নীলনদ ও আমেরিকায় অতিকায় আকারের কুমিররাই মানুষ খেকো হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ বর্মার লোনা জলার কুমিররা এক হাজার জন জাপানী সৈন্যকে খেয়ে ফেলেছিল। ১৯৭৮ সালে লোনা নদীর জলে ডুবে যাওয়া ষ্টীমারের চল্লিশ জন যাত্রীকে একদল কুমির খেয়ে ফেলেছিল ইন্দোনেশিয়ার একটি অঞ্চলে। এমনি ব্যাপক মানুষ খাওয়ার ঘটনা সচরাচর না ঘটলেও মানুষখেকো কুমিরের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়।

যতই হিংস্র বা মানুষখেকো হোক, কুমির সংরক্ষণে বন্যপ্রাণিবিশেষজ্ঞরা

সর্বদাই উৎসুক। জীবজগতে আর সব প্রাণীর মত কুমিরেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তা ছাড়া মানুষের সঙ্গে যতই শত্রুতা থাক, তার মূল্যবান চামড়ার জন্য সে তার পরম মিত্র। আগেই বলেছি, চামড়ার জন্য কুমির চাষ, অর্থাৎ কুমির লালন-পালনের জন্য বিশ্বময় তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

এদেশে অর্থাৎ ভারতেও কুমির সংরক্ষণের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। সাধারণ কুমিরদের চেয়ে মেছো কুমিরদের জন্যই প্রাণিবিশেষজ্ঞদের বেশী উদ্বেগ। কারণ মোট মাত্র একশোটা মেছো কুমির অবশিষ্ট আছে ভারত ও নেপালে।

আগেই বলেছি, মেছো কুমির বা ঘড়িয়াল ভারত ও নেপাল ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। ঘড়িয়ালের বিশেষত্ব হল তার লম্বা ছুঁচলো মুখ—তাতে একশোটা দাঁত একজোড়া করাতের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই ছুঁচলো মুখ দিয়ে সহজেই তারা মাছ ধরতে পারে। মাছই তাদের খাদ্য—মাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে সাধারণত তারা আক্রমণ করে না। মাছ তাদের খাদ্য হলেও সবরকম মাছে তাদের রুচি নেই। মানুষের কাছে যে সব মাছ অখাদ্য, তা খেতেই ভালবাসে ঘড়িয়ালরা। তথাপি উড়িষ্যার ও অন্যান্য অঞ্চলের জেলেরা মাছ বাঁচাবার জন্য ঘড়িয়াল নিধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া ঘড়িয়াল শুধু নয়, কুমিরকে বাঁচাবার জন্যও এদেশে বিভিন্ন প্রকল্প দেখা যাচ্ছে। শুধু চামড়ার লোভে নয়, কুমির ও ঘড়িয়াল নামক লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার তাগিদও এই সব সংরক্ষণ প্রকল্পে প্রেরণা জোগাচ্ছে।

কুমির আমাদের চোখে ভয়ঙ্কর ও বীভৎস, কিন্তু প্রাচীন মিশরের মানুষরা তাদের রূপে মুগ্ধ ছিল। প্রাচীন মিশরীরা নীলনদ থেকে কুমিরদের ধ'রে এনে তাদের পায়ে সোনার বালা পরিয়ে দিত। মিশরে না কি 'ক্রোকোডিলোপোলিস' নামে একটি শহর গ'ড়ে তোলা হয়েছিল একটি কুমিরের স্মৃতিতে। প্রাচীন গ্রীক ভূগোলবিজ্ঞানী ষ্ট্রাবো ক্রোকোডিলো-পোলিস-এর পুরোহিতদের কুমির পূজো করতে দেখেছিলেন। পূজো করাই

শুধু নয়, কুমিরদের মুখে রকমারি মুখরোচক খাদ্য এবং পানীয়ও পুরে দিতেন পুরোহিতরা।

কুমিররা যে মানুষের উপকারে আসতে পারে, সর্বপ্রথম মিশরীরাই তার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সর্বভুক কুমির যে মানুষের পক্ষে অপকারী মাছ, বিশেষ করে রাক্ষুসে মাছখেকো মাছ খেয়ে ফেলে মিশরীরা তা লক্ষ্য করেছিলেন। তা ছাড়া কুমিরের মল তাঁরা সার হিশেবে ব্যবহার করতেন।

কুমিরের মল যে সারবান এবং রাক্ষুসে মাছদের খেয়ে ফেলে তারা যে মানুষের উপকারই করে তা আজকের মানুষরা বুঝতে পারছেন। তা ছাড়া কুমিরদের দিয়ে সাধিত আর একটি উপকারের কথা শোনা যাচ্ছে। কুমিররা নদী ও জলার ধারে যে সব গর্ত তৈরি করে তাতে নাকি নানারকম প্রাণী আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করে।

কুমিরকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কুমিরকে বাঁচিয়ে রাখার মানে এই নয় যে পৃথিবীটাকে কুমিরময় করে তুলতে হবে। যে সব জায়গায় কুমির আছে সে সব জায়গায় কুমিরদের জন্য অভয়ারণ্য গ'ড়ে তুললেই লুপ্তপ্রায় কুমিরদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে। তা ছাড়া কুমিরের চামড়ার জন্য কুমির খামার গ'ড়ে তুলে কুমিরের চাষও করা যেতে পারে।

টাজারা

ধ্রুব গুপ্ত

এককালে দেশটার নাম ছিল উত্তর রোডেশিয়া। ১৯৬৪ সালের ২৪শে অক্টোবর ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীন হয়ে নাম হল জ্যাম্বিয়া (ZAMBIA)। আকৃতিতে নেহাৎ ছোট নয়, কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। কলকাতার লোকসংখ্যার অর্ধেক। খনিজ সম্পদে ধনী, মাটির নীচে সঞ্চিত আছে প্রচুর তামা, তাই বেচে দেশটা প্রচুর পয়সা

কামায়। তবে ফাঁপরে পড়ে তখনই যখন বিশ্বের বাজারে তামার দর কমে যায়, কেননা কিছু তামাক ছাড়া ঐ তামাই ওদের একমাত্র সম্বল। দেশে তৈরী হয় না অনেক নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ, তাই চড়া দামে বাইরে থেকে কিনতে হয় সূচ থেকে ট্র্যাক্টর পর্যন্ত অনেককিছু। প্রচুর পয়সা খরচ হয় তাতে। তবু দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটের ওপর ভালই, আমাদের দেশের মত দারিদ্র্য সেখানে চোখে পড়েনা।

কিন্তু একটা বড় সমস্যা রয়ে গেছে, দেশটি চারধারেই অন্যদেশের জমি দিয়ে ঘেরা, ইংরেজীতে যাকে বলে **land locked country** ; নিজেদের সমুদ্রবন্দর একটাও নেই। পূর্বদিকের ভারতমহাসাগর আর পশ্চিমদিকের আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল দেশটির সীমানা থেকে অনেক দূরে। বেচারা দেশটিকে তাই বাধ্য হয়ে অন্য দেশের বন্দরগুলি ব্যবহার করতে হয়। এখন অবশ্য প্রায় সবদিকেই বন্ধুভাবাপন্ন দেশ রয়েছে, কিন্তু বছর দশেক আগেও শুধু উত্তর-পূর্ব দিকের টানজানিয়ার সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব। তার উত্তর-পশ্চিম দিকের জাইরে (ZAIRE-স্বাধীনতার আগে নাম ছিল বেলজিয়ান কঙ্গো, এদেশেরই ইটুরি বনে এখনও পিগ্‌মিরা থাকে, আর থাকে কিছু গরিলা) দেশের সঙ্গে মোটামুটি ভাল সম্পর্ক। কিন্তু পূর্বদিকের মালাউইর (আগেকার নিয়াসাল্যাণ্ড) সঙ্গে তখন ভাব ছিল না, তার পূর্ব পশ্চিম দুইদিকে ছিল দুই পর্তুগীজ কলোনি, এ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক। দক্ষিণ পশ্চিমের বোৎসোয়ানা বন্ধুভাবাপন্ন বটে, কিন্তু সে দেশেরও একই দশা, সেটাও ভূমিবদ্ধ দেশ। দক্ষিণে ছিল শত্রু ভাবাপন্ন দেশ রোডেশিয়া (স্বাধীন হবার পর এখন মিত্রদেশ জিম্বাবোয়ে) আর তারও দক্ষিণে আরও শত্রু-ভাবাপন্ন দেশ—দক্ষিণ আফ্রিকা। এদেশেরই বন্দর কেপ্ টাউন (উত্তমাশা অন্তরীপ মনে পড়ছে ?) থেকেই বেশীর ভাগ জিনিষ আমদানী করতে হত জ্যাম্বিয়াকে, তামার লম্বা লম্বা বারগুলি (ইংরেজীতে ingot বলা হয়) রেলপথ ধরে কেপ্‌টাউন পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে জাহাজে করে সেই তামা যেত জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ডে।

এদিকে হয়েছে কি—পর্তুগীজ কলোনীদুটোতে (এখন দুটো দেশই স্বাধীন) এবং রোডেশিয়াতে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা

শাসিত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাতে (এখন বলা হয় নামিবিয়া)—স্বাধীনতার জন্য লড়ছিল যে সব নির্ভীক গেরিলা সৈনিক, জ্যাম্বিয়া তাদের নানাভাবে সাহায্য করছিল। রোডেশিয়ার স্বাধীনতার লড়াই-এর সৈনিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল জ্যাম্বিয়াতে। এই নিয়ে ১৯৭৩ সালে রোডেশিয়ার সঙ্গে জ্যাম্বিয়ার বাঁধল প্রবল ঝগড়া, যুদ্ধ বাঁধে আর কি? দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতের পথের ওপর উঠল কাঁটাতার—বিশ্ববিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কাছেই আর জ্যাম্বেসি নদীর উত্তর দিকের বিখ্যাত কারিবা বাঁধের ওপর। হ্যাঁ, একটা কথা বলে নিই, এই বাঁধ দেবার ফলে জাম্বেসি নদীর বক্ষে তৈরী হয়েছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কৃত্রিম হ্রদ—লেক্ কারিবা, জলে প্রচুর মাছ, বাঁধ থেকে প্রচুর জলবিদ্যুৎ (লোড শেডিং নেই ওখানে)। যাক, মূল কথায় ফিরে আসি। রেলপথে কেপ্‌টাউনে মাল আনা নেওয়া করা বন্ধ হল। জ্যাম্বিয়া পড়ল মহা মুস্কিলে।

মোজাম্বিকের বন্দর বাইরা দিয়ে জ্যাম্বিয়া মালপত্র আমদানী রপ্তানী করতে হলে যেতে হত রোডেশিয়ার ভেতর দিয়ে। এখন মাল পাঠাবার পথ রইল হাইওয়ে ধরে (Great East Road) প্রথমে মালাউয়ির সালিমা শহরে তারপর রেলপথে মোজাম্বিকের বন্দরে। অনেক ঝামেলা ও খরচের ব্যাপার।

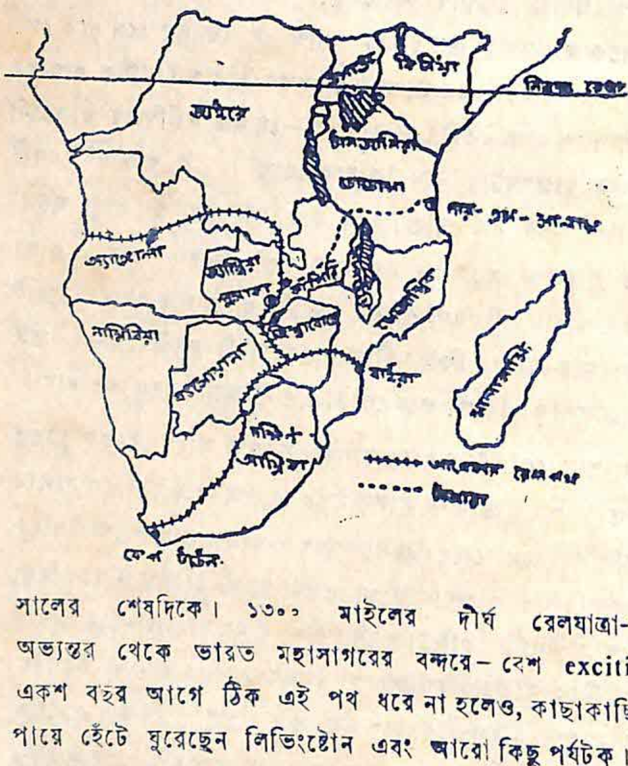
জাইরের ভেতর দিয়ে গেছে বেঙ্গুয়েলা রেলপথ, সোজা জ্যাম্বিয়ার 'কপারবেল্ট' প্রদেশ থেকে, কিন্তু সেটা সমুদ্রে পৌছেছে এ্যাঙ্গোলার লোবিতো বন্দরে। ১৯৭৪-৭৫-এ এ্যাঙ্গোলায় শুরু হল গৃহযুদ্ধ—পর্তুগীজরা তার আগেই পালিয়েছে কলোনী ছেড়ে রাতারাতি স্বাধীনতা দিয়ে—গৃহযুদ্ধের ফলে সেই রেললাইন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কাজেই একমাত্র ভরসা রইল বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র টানজানিয়ার সাহায্য নেওয়া, সে দেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দর দার-এস-সালামকে বিশ্বের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগের সূত্র হিশেবে ব্যবহার করা।

ইংরেজ আমলেই জ্যাম্বিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল গ্রেট নর্থ রোড নামে এক কাঁচা সড়কের মধ্য দিয়ে। গত শতাব্দীর শেষদিকে ইংরেজরা দক্ষিণ থেকে উত্তরে যতটা যাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করেছিল নিজেদেরই স্বার্থে, পাছে

আফ্রিকার অন্য জায়গাগুলি ইয়োরোপের অন্য দেশগুলি না গ্রাস করে নেয়। ঠেকাতে পারেনি অবশ্য, জার্মান, পর্তুগীজ, ফরাসী এবং বেলজিয়ানদের সঙ্গে রফা করতে হয়েছিল ১৮৮৪-তে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের এক বৈঠকে এবং পরে আরো ছোট ছোট চুক্তি মারফৎ। তোমরা বোধ হয় অনেকে জানো যে রোডেশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সিসিল্ রোডস্ এর স্বপ্ন ছিল কেপটাউন থেকে কায়রো পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের। সে স্বপ্নের ছেদ ঘটেছিল, কেপটাউন থেকে জ্যাম্বিয়ার কপারবেল্ট পর্যন্ত সে রেলপথ এসে ঘুরে গেল সোজা পশ্চিম দিকে জাইরে ও এ্যাঙ্গোলার ভেতর দিয়ে আটলান্টিক সাগরের দিকে। পাশাপাশি রাস্তা তৈরীর প্ল্যানও ছিল—যে জন্য জ্যাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকার প্রধান রাজপথটার নাম 'কায়রো রোড'। ঐ রাস্তারই একটি অংশ স্বরূপ ছিল গ্রেট নর্থ রোড। সে রাস্তা বর্ষাকালে ছিল সম্পূর্ণ অচল, দুর্ঘটনা ঘটত প্রায়ই। প্রচুর বড় বড় লরী উল্টে পড়ত। তাই এ রাস্তা কুখ্যাত হয়েছিল 'Killer Road' নামে। স্বাধীন হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই রাস্তাটা পাকা হয়ে গেল। কিন্তু লরীতে করে ভারী ভারী জিনিষ কতই আর আনা যায় বলো? বিশেষ করে পেট্রোল ও ডিজেলের যখন এত দাম।

এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে জ্যাম্বিয়া সরকার আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা ভাবতে লাগল নতুন রেলপথ দিয়ে দার এস-সালাম বন্দরকে জ্যাম্বিয়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায় কিনা। তারা পরামর্শ চাইল ইয়োরোপ আমেরিকার কাছে। তারা ত ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিল, বলল খরচে পোষাবেনা। কাজটাও খুব কঠিন, দক্ষিণ টানজানিয়ার পাহাড় কেটে রেলপথ নিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য টানেল দরকার হবে। জ্যাম্বিয়া সরকার তখন সাহায্য চাইল চীন দেশের কাছে। তারা রাজি হল রেলপথ তৈরী করে দিতে। কাজ শুরু হল ১৯৬৯ সালে, শেষ হল ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই নতুন রেলপথের নাম হল TAZARA (Tanzania-Zambia Railway) সাম্রাজ্যবাদবিরোধ ও স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ বিবেচিত হল এই রেলপথ। টানজানিয়ার সোয়াহিলী ভাষাতে এর নাম হল উহুরু রেলপথ বা Freedom Railway। জ্যাম্বিয়া খোলা ওয়াগানে

(চুরি যাবার ভয় নেই) বোঝাই করে তামা পাঠাতে লাগল দার-এস-সালামে। নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ, ভারী যন্ত্রপাতি, খাদ্যবস্তু, ওষুধপত্র, কাগজ ও খাতা (তাও জ্যাম্বিয়াতে তৈরী হয়না।) বই আনা হতে লাগল দার-এস-সালাম থেকে লুসাকাতে। তোমরা হয়তো ভাবছো আবার কেন ইতিহাস ভূগোল টেনে আনা? কিন্তু এইটুকু না জানলে TAZARA-র গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারবে না তাই এই গৌরচন্দ্রিকা।



যাক্ এই রেলপথ শুধু মাল-বাহী হয়েই থাকল তা ভেবো না। প্রথমে সপ্তাহে একটি, পরে দুটি যাত্রী-বাহী ট্রেনও চালু করা হল ১৯৭৫ সালের শেষদিকে। ১৩০০ মাইলের দীর্ঘ রেলযাত্রা-মধ্যআফ্রিকার অভ্যন্তর থেকে ভারত মহাসাগরের বন্দরে- বেশ exciting ব্যাপার। একশ বছর আগে ঠিক এই পথ ধরে না হলেও, কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন লিভিংষ্টোন এবং আরো কিছু পর্যটক। লিভিংষ্টোন মারা যান ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জ্যাম্বিয়ারই অভ্যন্তরে চিটাম্বো গ্রামে সেখানে এখনও রয়েছে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় তার স্মৃতি সৌধ, তার বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয় সুসি এবং চুমা তার মরদেহ থেকে হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলে পুঁতে রেখেছিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায়, আর দেহটি দুজনে অসহ্য কষ্ট

স্বীকার করে নিয়ে গিয়েছিল দার-এস-সালামের কাছেই জাঞ্জিবার দ্বীপে—সেই দীর্ঘ পথ আমরা আধুনিক রেলগাড়ীর কামরাতে পরম আরামে অতিক্রম করে গেলাম একশ বছর পরে। ভাবতে অবাক লাগে, তথাকথিত অন্ধকার মহাদেশ এখন আর অন্ধকার নেই, যদিও আমরা অনেকেই সে ব্যাপারে এখনও কিছুটা অন্ধ।

রাজধানী লুসাকা থেকে ঠিক ট্রেনটা ছাড়েনা, ছাড়ে লুসাকার ১২০ মাইল উত্তরে কাপিরি ম্‌পোশি নামে একটি ছোট শহর থেকে, যেখানে সে সময়ে সবে একটা কাঁচ তৈরীর কল বসানো হয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, চাইনিজদের রেলপথের মাপ এবং ব্রেক্‌সিস্টেম জ্যাম্বিয়া রেলওয়ে থেকে আলাদা। যাইহোক এই কাপিরি থেকে নতুন রেলপথ শুরু হয়ে গেছে সোজা সমুদ্রের দিকে—বিশাল এক ধমনীর মতো, যাকে বাদ দিলে জ্যাম্বিয়ার অবস্থা বিপদাপন্ন হত সে সময়।

কাপিরিতে নতুন ষ্টেশনের ছিমছাম স্থাপত্যে চোখ জুড়িয়ে গেল। সাধারণত জ্যাম্বিয়ানরা বেশ পরিষ্কার—তারা রাস্তাঘাট নোংরা করে না, যেখানে সেখানে থুতু ফেলে না। খানিকটা নতুন বলেও অবশ্য ষ্টেশনটা ছিল ঝকঝকে। কাউণ্টারে রিজার্ভেশন শ্লিপ দেখাতে গিয়ে দেখি বসে আছেন একজন চৈনিক ভদ্রলোক—সে ব্যাপারে তদারক করতে, সঙ্গে আছেন একজন টানজানিয়ান গার্ড ও একজন জ্যাম্বিয়ান কেরাণী। চৈনিক ব্যক্তিটি মনে হল তুটি মাত্র ইংরেজী শব্দ জানেন, 'no, no', এবং 'wait wait'! যতবার বলছি আমরা লুসাকা থেকেই দু সপ্তাহ আগে booking করেছি সে ততবারই দু হাত তুলে বলে, 'নো নো, ওয়েট, ওয়েট।' এদিকে সকাল দশটা বাজতে চলল গাড়ী ত আর আমাদের জন্য wait করবে না! শেষপর্যন্ত টানজানিয়ান গার্ডটি বললেন চলে আসুন আমার সঙ্গে। তার পেছন পেছন স্যুটকেস্ হাতে করে আমরা ছুটলাম এক সেকেণ্ড ক্লাস কামরার দিকে। ট্রেন ছাড়তে তখন মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। জানি না কোথায় বসব বা রাত্রে শোবো; আদৌ শুতে পাব কিনা কে জানে। উঠে করিডরে দাঁড়লাম ট্রেন ছেড়ে দিল। একটি বাঙ্গালী পরিবার আমাদের তুলে দিতে এসেছিল—তাদের সঙ্গে কোনমতে হাসি বিনিময় করে আমরা

আবার নিজেদের জায়গা খুঁজতে ব্যস্ত হলাম। অগতির গতি বলে একজন জ্যাম্বিয়ান কর্মীকে ধরলাম। সে শেষকালে একটা চার বার্থের কুপেতে আমাদের পুরে দিল। সেখানে গিয়ে দেখি পর্বতপ্রমাণ কম্বল ও বালিশের সমাবেশ—রাত্রে যাত্রীদের দেওয়া হবে নিখরচাতে, আমাদের মতো বেডিং টানাটানির দরকার নেই। দুটো বার্থ থেকে সেগুলি সরিয়ে কোনমতে আমাদের বসতে দিলেন তিনি এবং বার বার আশ্বাস দিলেন যথাসময় কম্বলবালিশ যথাস্থানে চলে যাবে আমরা হাত পা ছড়িয়ে শুতে পারবো।

অত্যন্ত ধীর গতির ট্রেন। সবে লাইন বসানো হয়েছে বলে আস্তে আস্তে চলেছে। ১৩০০ মাইল যেতে সময় নেবে ৪৮ ঘণ্টা—গতিবেগ কি বুঝতে পারছ। তবু মনে হল এই ভাল, আমাদের ত কোন তাড়া নেই, দেখতে দেখতে ধীরে সুস্থে যাওয়া ভাল। রাজধানী এক্সপ্রেস বা অন্য মেইল ট্রেন এত জোরে চলে—মনে হয় একটা এরোপ্লেন টেক্ অফ্-এর আগে ক্রমাগত রানওয়ে দিয়ে ছুটছে ত ছুটছেই। মনে পড়ে গেল যাযাবরের লেখা 'দৃষ্টিপাত' বইটির একটা বাক্য—বিজ্ঞান কেড়ে নিয়েছে আবেগ, দিয়েছে বেগ।

মোটামুটি স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসবার পর ট্রেনটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। পুরোটাই ভেষ্টিবল, প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর পার্থক্য শুধু গদির—মোটা সরুর ব্যাপারে, অথচ ফার্ষ্ট ক্লাসের ভাড়া কিন্তু ডবল। দ্বিতীয় শ্রেণী আমাদের দেশের 'রাজধানী' বাদ দিলে যে কোন দূরপাল্লার ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর চেয়েও ভাল। তৃতীয় শ্রেণীতে শোবার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু পরিষ্কার সানমাইকা দিয়ে ঢাকা চেয়ার—বসে যথেষ্ট আরাম। মাঝখানে ছোট ডাইনিং কার।

দুধারে জ্যাম্বিয়ার সুউচ্চ বৃক্ষশ্রেণী ঘনবনের দৃশ্য—সেই সবুজকে আরো চমৎকার দেখাচ্ছে গেরুয়া মাটির রঙের জন্য। (আবার একটু খবর দিচ্ছি—জ্যাম্বিয়ার মাটি laterite-এ ভর্তি বলে খুব উর্বর নয়—নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলো ছাড়া, আর যে গাছগুলির কথা বলছি তা থেকে খুব পোক্ত কাঠ হয় না)। হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে ব্রীজের নীচে দিয়ে চলে গেছে ঝকঝকে পাকা রাস্তা, গ্রেট নর্থ রোড। জ্যাম্বিয়ার উত্তর প্রদেশের রাজধানী কাওয়ামা

(Kawama) পৌছতে রাত হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই উত্তর জ্যাম্বিয়ার একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্তি এসেছিল বলে আমরা থর্ হেইয়ারডালের Ra; Aku-Aku আর Kontiki পড়তে শুরু করেছিলাম। আশ্চর্য সাহস আর অদম্য প্রাণশক্তি এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান লোকটির। পাপাইরাস (যা দিয়ে প্রাচীন মিশরীরা কাগজ বানাত) যা অনেকটা সবুজ নলখাগড়ার মতো দেখতে, তাই দিয়ে নৌকো বানিয়ে মহাসমুদ্র পাড়ি দেবার কাহিনী আমরা পড়ছিলাম নিশ্চিন্ত আরামে গা এলিয়ে দিয়ে, বৈদ্যুতিক আলোর নীচে।

ভোর হতেই জেগে দেখি বাইরের ল্যাণ্ডস্কেপ বেশ বদলে গেছে। ঘন অরণ্যের বদলে ইতস্তত ছড়ানো ইউক্যালিপটাস গাছ। মাটিও জ্যাম্বিয়ার সমতল মালভূমির মতো আর নেই—পূর্বে পশ্চিমে ঘন নীল পাহাড়ের রেখা। আমরা টানজানিয়াতে প্রবেশ করেছি। ও হ্যাঁ, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠিয়ে কাষ্টমস্ ও পুলিশ বিভাগের লোকেরা পাসপোর্ট দেখে গিয়েছিল, কোন ঝামেলা করেনি। অথচ মোটরে বা বাসে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বছর দু এক আগে এরা কি হয়রানিই না করেছিল। স্যুটকেস্ খুলে জামা কাপড় ওলট পালট করে একাকার কাণ্ড। গাড়ির বুট খুলে বার বার দেখেছিল আমরা জ্যাম্বিয়া থেকে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে পালাচ্ছি কিনা। ট্রেনে এ সব ঝামেলা নেই দেখে স্বস্তি পেয়েছিলাম। সীমান্ত থেকে একটু ভেতরেই পাহাড়ের কোলে অপূর্ব সুন্দর ছোট শহর ম্‌বেইয়া (Mbeya)। যখন গতবার গাড়ীতে এ পথে গেছি তখন এ শহরে এক শিখ ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। ভদ্রলোক প্রথমে সরকারী চাকরি করতেন। তারপর অবসরপ্রাপ্ত হয়ে প্রচুর জমি কিনে চাষবাস শুরু করেন। কিন্তু ১৯৬৭ সালে টানজানিয়ান সরকার সমস্ত ভূসম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করেন, অর্থাৎ তারপর থেকে কোন ব্যক্তি বিশেষ জমির মালিক হতে পারবে না, জমি হবে দেশের জনগণের সম্পত্তি। ভদ্রলোক তারপর এক ফটোগ্রাফির দোকান করেছিলেন। ছেলেরা গ্যারাজ খুলে পয়সা কামাচ্ছে। এবারে তার সঙ্গে দেখা করা হল না। গাড়ীর রাস্তা শহরের ভেতর দিয়ে যায়, কিন্তু রেল স্টেশন বেশ দূরে। শুধু মিঃ বাবলার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ত আর নাবা যায় না। দূর থেকে দেখি উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেষে সুন্দর শহর ম্‌বেইয়াকে। ঐ

পাহাড়ের ওপারে রুকুওয়া হ্রদ। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়—চোখ চলে যায় দূরে মালাউইর উত্তরাঞ্চলে এবং টানজানিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত ঘেষে সোঙ্গিয়া (Songea) অঞ্চলের পর্বতশৃঙ্গগুলির দিকে, পায়ের তলায় প্রস্ত উপত্যকা। এই জায়গার নামকরণ হয়েছে "End of the World"।

ম্‌বেইয়া ছেড়ে ট্রেন চলল উত্তর-পূর্ব দিকে। একের পর এক টানেলের ভিতর দিয়ে। সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলেছে মন্থর গতিতে; জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বেশ দেখায়। যেই ক্যামেরা তুলেছি অমনি বন্দুকধারী গার্ড এসে আমাকে নিরস্ত করে বললেন "নিরাপত্তার খাতিরে ট্রেনের ফটো তোলা নিষিদ্ধ"। ভয়ে ভয়ে ক্যামেরা গুটিয়ে শুধু চোখেই দেখতে লাগলাম। একটা জিনিষ চোখে পড়ল—প্রতিটি ষ্টেশনই দেখতে একই ধরণের আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে চৈনিক কর্মীরা, কি ছেলে কি মেয়ে সবারই পরনে ছাই রং-এর পায়জামা কুর্তা। মুখে হাসি নেই। হঠাৎ একটা ষ্টেশনে একটি চাইনিজ মেয়েকে হাসতে দেখে আমার মেয়ে বলল ঐ ত চীনে মুখে হাসি। তবে সত্যিকারের হাসির মতো দেখাচ্ছে ষ্টেশনের গায়েই লাগানো নানারকমের তরিতরকারীর ও ফুলের বাগান। সঙ্গে রয়েছে ছোট ছোট মুর্গী ও শুয়রের খাঁচা, স্বনির্ভরতার নজীর এভাবে চীনদেশের কর্মীরা আফ্রিকানদের সামনে তুলে ধরেছে—এটা উহুরু রেলপথের একটা শুভ দিক।

জ্যাম্বিয়াতে পথের ধারে দেখা যায় অসংখ্য উইঢিপি—শক্ত হয়ে সেগুলো পাথরের মতোই হয়ে যায় প্রায়, তাই ইংরেজীতে এদের বলা হয় ant hill। টানজানিয়াতে সেগুলি চোখে পড়ল না। তবে বিশাল বিশাল পাথরের চাই দিয়ে তৈরী টিলা (দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ্ বংশধরদের ভাষায় যাকে বলে Kopje কোপিয়ে) দেখা গেল প্রচুর, আর জ্যাম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের মতো এখানেও দেখা গেল বিখ্যাত কিন্তু অতি কদাকার দর্শন বাওবাব্ গাছ। বেশীর ভাগ সময়ই পাতা থাকে না গাছে, গুড়িটা বিশাল এবং কেমন যেন বিকলাঙ্গ দেহের মতো দেখতে। ফল নাকি খেতে সুস্বাদু।

ঘুরতে ঘুরতে তৃতীয় শ্রেণীর একটা কামরায় গিয়ে দেখি সেখানে

টানজানিয়ার রাজধানী দার-এস-সালামের ইণ্টারন্যাশনাল স্কুলের এক আমেরিকান শিক্ষক বসে আছেন। জ্যাম্বিয়া থেকে আসছি শুনে সে দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। লুসাকা শহরের জলবায়ু এবং রাস্তাঘাট অনেক ভাল বলতেই একজন টানজানিয়ান সহযাত্রী হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন "তবে এদেশে বেড়াতে এসেছেন কেন, এখানে নামিয়ে দিলে কে উদ্ধার করবে।" 'দুঃখিত', বলে মানে মানে সরে পড়লাম।

ট্রেনে ডাইনিং কার থাকবে কি না সঠিক না জানায়, সঙ্গে কিছু টিন ভর্তি মাছ, রুটি, ডিমসেদ্ধ নিয়েছিলাম। সেগুলি প্রথম দিনেই শেষ হয়ে গেল। দুপুরে ডাইনিং কারে খেতে গেলাম। মেনু—ন্‌শিমা (Nshima) ও মাংসের কারী। ন্‌শিমা হল ভুট্টার ছাতু সেদ্ধ। বিস্বাদ খেতে—তবে খিদের মুখে তাই অমৃত বোধ হল, তা ছাড়া মাংসের কারীটা মন্দ ছিল না। ন্‌শিমা জ্যাম্বিয়া ও টানজানিয়ার মধ্যবিত্তদের খাদ্য। আমাদের ভাতের মতো, মাংস রোজ মেলে না, কুমড়োর ঘ্যাঁট বা কাপিণ্টা নামে মৌরলা মাছের মতো ছোট মাছের শুঁটকীর ঝোল এরা সাধারণত খায়। গরীবরা কাসাভা বলে এক ধরণের মেটে আলু সেদ্ধ খায় ন্‌শিমার বদলে।

বাতাস গরম হতে শুরু করেছে, আমরা ছ'হাজার (৬০০০) ফিট উচ্চতা থেকে সমুদ্রের কাছাকাছি সমতল ভূমিতে নামতে শুরু করেছি বোঝা গেল। এদিকে রাত এসে গেছে। আমেরিকান শিক্ষকটি আগেই বলেছিল "দুঃখের বিষয় ট্রেন একেবারে মিকুমি গেম্ পার্কের মধ্য দিয়ে যাবে, কিন্তু আমরা কিছুই দেখতে পাবো না, রাত হয়ে যাবে।" আমি একটু ভেবে বললাম—"ফেরার পথে দেখতে পাবো, সকাল থাকবে তখন।" দ্বিতীয় রাত্রির ঘুমের জন্য তৈরী হলাম। গত রাত্রে আরাম করে কম্বল মুড়ি দিয়েছি, সেরাত্রে ট্রেনের পাখা খুলতে হল—কম্বল তো দূরের কথা।

ঘুম ভেঙ্গে দেখি দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে—সারি সারি নারকেল গাছ। ঘেমো গরম। ট্রেন আস্তে আস্তে ঢুকল দার-এস-সালামের বিশাল ষ্টেশনে দূর থেকে দেখে মনে হবে সুন্দর এক মন্দির।

দার-এস সালাম শহর বোম্বের একটা ছোট সংস্করণ। অবশ্য আগে চার পাশ থেকে হিন্দী ফিল্মের গান শোনা যেত অতটা এবার শোনা গেল না

—ভারতীয়রা অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেছে। অবশ্য আফ্রিকানরা অনেকেই হিন্দী ছবি ও তার গান পছন্দ করে। দেখলাম একটি সিনেমা হলে দেখানো হচ্ছে হিন্দী 'অমানুষ'।

দার-এস-সালামের সমুদ্রতীর বা ষ্ট্রাণ্ডটি চমৎকার। তবে সমুদ্র সেখানে পুকুরের মত শান্ত। সামনে দেখা যাচ্ছে অনেক সমুদ্রগামী জাহাজ। শুধু মালবাহী জাহাজ নয়। এখান থেকে বোম্বে ও কোচিন পর্যন্ত যাত্রীবাহী জাহাজ মাসে একবার ছাড়ে। সমুদ্রস্নানের আনন্দের খোঁজে যেতে হল শহর ছাড়িয়ে দূরে, কিন্তু সেখানেও পুরীর সমুদ্রের তুলনায় সমুদ্র শান্ত। ব্রেকার্স নেই তেমন।*

একটা জিনিষ দেখে এবং শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। শহরটির জমজমাট ভাব কমে গেছে। এক গুজরাতি পরিবার সাবধান করে দিলেন সন্ধ্যে সাতটার পর Strand-এ না থাকতে—চুরি ছিনতাই বেড়ে গেছে। বীচে স্নান করতে গেলেও একলা যেতে বারণ করল সবাই। আশ্চর্য ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এ শহর ছিল কলকাতার মতো গমগমে। লুসাকার সঙ্গে তুলনায় এ শহরের চাকচিক্য অনেক কম। রাস্তার ধারে ময়লা স্তূপীকৃত দেখে সন্দেহ হল এটি আমাদেরই দান বোধ হয়। লুসাকাতে এদৃশ্য কল্পনা করা যায় না।

বেশ কিছু দিন থাকব এখানে, লবঙ্গ বনের দেশ জাঞ্জিবার দ্বীপেও যাব (আবার একটা জানবার কথা-১৯৬৩ সালে টাঙ্গানিইকা ও জাঞ্জিবার যুক্ত হয়ে একদেশ গঠিত হয়—Tanganiyaka-র Tan এবং Zanzibar-এর zan মিশিয়ে নতুন নাম হয় Tanzania)। কিন্তু সে সময় কি একটা উৎসব চলার দরুণ যাওয়া গেল না ভেসে বা উড়ে—সিট মিলল না। দার-এস সালামের মিউজিয়ামে দেখতে গেলাম—টানজানিয়ারই ওলডুভাই নদীখাতে আবিষ্কৃত আদিম মানব 'জিন্‌জানথ্রপাস' (Zin zan thropus) এর মাথার খুলি। ১৯৫৯ সালে বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক ডঃ লিউইস্ লিকি (Dr, Lewis Leaky) ও তাঁর স্ত্রী এই নিদর্শন আবিষ্কার করেন। কেনিয়া ও ইথিওপিয়ার সীমানাতে লেক্ রুডলফের ধারে তাঁরই পুত্র রবার্ট

*রাজধানী যাতে দেশের মাঝখানে হয়, সেই উদ্দেশ্যে দার-এস-সালাম থেকে তা মধ্য টানজানিয়ার ডোডোমাতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে শহরে অনেক কোপিয়ে (Kopje) আছে।

লিকি আরো পুরোনো মানুষের দেহাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় নাটাল অঞ্চলে রেমণ্ড ডার্ট আবিষ্কার করেছেন অষ্ট্রালোপিথেসিন্ (**Australopithecine**) এর দেহাবশেষ। ২০ লক্ষ বছর আগে এদের মধ্যেই মানবজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল। এই কারণেই সবাই মনে করেন আফ্রিকাতেই মানুষের জন্মস্থান।

কিন্তু 'পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য'? না, সেখানে মানুষেরই প্রয়োজনে রক্ষা করতে হবে গাছপালা ও বন্যপ্রাণীদের। সেই উদ্দেশ্যে টানজানিয়াতে সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন একাধিক গেম পার্ক। 'সেরেঙ্গটি', 'নগোরোংগোরো'র নামতো তোমরা শুনেছ। 'Born Free', 'Ape and Super Ape' ছবিতে সেসব জন্তুর পরিচয় তোমরা পেয়েছ। হাজার হাজার বিদেশী টুরিষ্ট এসব দেখতে আসে—ফলে টানজানিয়ার সরকার বেশ দু পয়সা কামিয়ে নেন। মিকুমি গেম পার্ক অবশ্য ততটা কুলীন নয়। তবু এখানেও অনেক জন্তু রয়েছে বিশেষ করে হাতি, জিরাফ, নানা ধরণের হরিণ, জেব্রা ইত্যাদি। ফিরতি পথে দিনের বেলা পড়ল। ট্রেন চলল ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে। মনে হল দুটি উদ্দেশ্যে—পাছে কোন জন্তু ট্রেনে কাটা না পড়ে, এবং সেই সঙ্গে যাত্রীরাও যতটা পারেন দুপাশের পশুগুলিকে দেখতে পান। দেখা গেল অসংখ্য হাতি, জেব্রা, কিছু জিরাফ ও অসংখ্য হরিণ।

এবার ঘরে ফেরার পালা। 'ঘর' মানে বিদেশীঘর জ্যাম্বিয়াতে। এখন অবস্থা পালটেছে। জ্যাম্বিয়া এখন জিম্বাবোয়ের (প্রাক্তন রোডেশিয়া) ভেতর দিয়ে মাল পাঠাচ্ছে, কাজেই এই রেলপথের অর্থনৈতিক গুরুত্ব একটু কমেছে হয়তো। কিন্তু যাত্রীবাহী গাড়ীর গুরুত্ব এখনও রয়েই গেছে, আর ষ্টেশনগুলোকে ঘিরে নতুন বসতি ও খামার গড়ে উঠছে— ছোট ছোট শহরও তৈরী হচ্ছে ছোট ছোট কারখানাকে কেন্দ্র করে জ্যাম্বিয়ারই MPIKA (মৃপিকা) শহরে রেলের ফ্যাক্টরি তৈরী হয়েছে। তাছাড়া আফ্রিকার দেশে দেশে বাদবিসংবাদের এই অশুভ মুহূর্তে এই রেলপথ এক বন্ধুত্বের প্রতীক সেটা ভুললে চলবে না।

সম্প্রতি শুনে খুব খারাপ লাগল যে এর পরিচালন ব্যবস্থায় খুব অবনতি

দেখা দিয়েছে। চীনারা কয়েকটি টেক্‌নিকাল কাজের ভার বাদে রেলপথটি চালাবার দায়িত্ব জাম্বিয়ান ও টানজানিয়ানদের হাতে দিয়ে দিয়েছে। নিজেদের জিনিষ নিজেরা ভাল ভাবে চালাতে না পারা—এটা আফ্রিকা, এশিয়ার নতুন স্বাধীন দেশগুলোর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। পরনির্ভরতা কি আমাদের কিছুতেই যাবে না?

ভাগ্যিস্‌

নির্মলেন্দু গৌতম

ভিজতে ভিজতেই বাস এসে দাঁড়াল। রাজু বাসের নম্বরটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিয়ে এক ছুটে গিয়ে উঠল বাসে।

বাসে একেবারেই ভিড় নেই। টুপিটা খুলে ভাঁজ করে ওয়াটারপ্রুফের পকেটে রাখল রাজু। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে ওয়াটারপ্রুফ থেকে। সেটাও খুলে ভাঁজ করে হাতে নিয়ে নিল।

অনেকেই তাকিয়ে দেখছে তাকে। রাজু সবাইকে একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে এগিয়ে এসে একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ল।

সেই কখন থেকে চলেছে বৃষ্টি। স্কুলের ছোট মাঠটা ছুটির আগেই থৈ থৈ হয়ে গেছে জলে। রেনওয়াটার-পাইপ থেকে ঝরনার মতো ফেনা তুলে লাফিয়ে পড়ছিল বৃষ্টির জল। ছুটির খানিক আগে বৃষ্টি ধরেছিল একটু-খানি। ছুটি হতেই আবার ঝর্‌ঝর্‌ করে শুরু হয়েছে।

রাজুর অবশ্য ভালোই লাগছে। রোজ ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে করে আনতে হয়। একদিনও তা কাজে লাগেনি। আজ দিব্যি সেটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাজু। টুপিটা মাথায় দিতে নিজেকে আরো বড়ো মনে হয়েছিল যেন।

গত বছর থেকে একাই বাসে চেপে বাড়িতে ফেরে রাজু। ফাইভে ওঠা মানেই তো বড়ো হয়ে যাওয়া। তাছাড়া প্রায় ডিপো থেকেই বাসে ওঠে রাজু। ফেরার সময় কোনো রকমে বাসে উঠে পড়লেই হল।

মার অবশ্য ভয়ের শেষ নেই। স্কুলে যাবার সময় তাই হাজারবার সাবধান করে দেন মা। রাজু মনে মনে হাসে।

ছোটকাকুর মতোই তো ভিড়ের মধ্যে উঠতে পারে রাজু—নামতেও পারে জায়গামতো। মা তো ভাবতেই পারেন না। মাকে একদিন দেখিয়ে দিতে হবে বাসে ওঠা।

আজ যা বৃষ্টি, মা নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন। অথচ মা বুঝতেও পারছেন না, রাজু কি খুশিতে ফিরছে বাসে। মনে মনে হাসল রাজু।

জল ভেঙে বাস চলেছে। বাসের চাকায় জল ঠেলবার শব্দ হচ্ছে। সেই শব্দটুকু ভারি ভালো লাগছে। রাজু বৃষ্টির ভেতর ভিজতে থাকা দোকান, সাইনবোর্ড, লোকজন—সব দেখতে থাকল খুশি খুশি চোখে।

হঠাৎ এ কী, বাস ঘুরে যাচ্ছে কেন? চম্‌কে উঠল রাজু।

শুধু রাজুই নয়, সব্বাই চম্‌কে উঠেছে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বুঝতে পারল রাজু। পেছন দিক থেকে দুয়েকজন কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেসও করল কিছু।

রাস্তা খারাপ, জলও জমেছে। কাজেই খানিকটা ঘুরে যাবে বাস। বারকয়েক কথাটা শুনিয়ে দিল কণ্ডাক্টার।

রাজু তো একেবারে শেষে নামবে। কাজেই ভাববার কী আছে রাজুর! পিঠ থেকে ব্যাগটা খুলে নিয়ে কোলের ওপর রেখে বসল রাজু।

একটা গল্পের বই এনেছে অমিতাভর কাছ থেকে। ব্যাগ থেকে বইটা বের করে একবার উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে ইচ্ছে হল রাজুর। চারদিকে একবার তাকিয়ে বইখানা বের করে ফেলল ব্যাগ থেকে। ঘুরে যখন বাস যাচ্ছে তখন একটু বেশি সময় লাগবেই। শুধু শুধু বসে থেকে লাভ কী! বইয়ের মলাট খুলে প্রথম পাতায় চোখ রাখল রাজু। আর

সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল সব কিছু।

পাঁচ পাতা শেষ হবার আগেই হঠাৎ গাড়িটা গোঁ গোঁ শব্দ করে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো বারকয়েক। তারপর আস্তে আস্তে ফুটপাথের গা ঘেঁসে থেমে যেতেই লাফিয়ে উঠল রাজু। একী, থামল কেন গাড়ি। ব্রেকডাউন হল নাকি গাড়িটা!

সত্যিই ব্রেকডাউন হয়েছে গাড়িটা। আর চলবে না।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে এসে টিকিটের পয়সা ফিরিয়ে দিতে লাগল কণ্ডাক্টার। কিন্তু রাজু কী করবে?

বইটা ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়িয়ে ভাবল রাজু। তারপর পিঠে বেঁধে নিল ব্যাগটা। এখনও বৃষ্টি চলছে বাইরে। মেঘে মেঘে তেমনি অন্ধকার চারদিক।

বাস থেকে তো নামতেই হবে। ভয়ে ভয়েই ওয়াটারপ্রুফটা পরে, বাস থেকে নেমে পড়ল রাজু।

কিন্তু কোন্ জায়গায় থেমেছে বাসটা? নেমে পড়ে চারদিক তাকাল রাজু। ঠিক যেন বোঝা যাচ্ছে না। বইটা পড়তে না থাকলে তবু দেখতে দেখতে চিনতে পারত।

নাহ্, এদিকে কখনও আসেনি রাজু।

এসব কথা ভাবতেই রাজুর কেমন যেন একা-একা মনে হল নিজেকে।

বাসের লোকজন এদিকে ওদিকে চলে যাচ্ছে। ভিজছে অনেকেই।

যেদিকে সবাই যাচ্ছে, সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল রাজু। কী জানি ওদিক দিয়ে যদি আরো বেশি ঘুরতে হয়!

হঠাৎ, ঠিক তখুনি, ভাঙা গলায় কে যেন ডাকল পেছন থেকে, 'এই যে খোকা, কোথায় যাবে?'

চমকে তাকাল রাজু। লম্বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একজন লোক। টানটান লম্বা চুলগুলো ভিজে মুখের সামনে পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। হাতলভাঙা একটা ছাতা তার হাতে। লোকটি হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করল কেন?

রাজু ভয় পেল। কী জানি, সেই যে গল্প শুনেছিল, ছোটদের একা

পেলেই—

'বাড়ি যাবো।' বলেই সামনের একটা গলিতে ঢুকে পড়ে প্রাণপণ জোরে হাঁটতে থাকল রাজু।

অনেকটা এসে পেছনে একবার ভালো করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজু। আর সঙ্গে সঙ্গে রাজু বুঝতে পারল এবার একেবারেই পথ হারিয়ে ফেলেছে।

কী হবে এখন?

চারদিকে তাকাল রাজু। অন্ধকার যেন আরো বেড়ে উঠেছে। বৃষ্টিও পড়ছেই। এক্ষুনি নিশ্চয়ই পথের আলোগুলো জ্বলে উঠবে।

কিন্তু রাজুর কী হবে?

কান্না পেল রাজুর। তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল চারদিকে তাকাতে তাকাতে।

কিন্তু তাতেই যেন গোলমাল হয়ে গেল আরো। চারদিকের যা কিছু সব যেন এখন একরকম মনে হচ্ছে। ইস্, কেন যে তখন না ভেবে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

তাহলে কি রাজু আর ফিরতে পারবে না?

গলির ভেতর এ বাড়িতে ও বাড়িতে সব্বাই তো খুশিতে আছে। রাজু দেখতে পেল। কেউ তো আর এমনি বর্ষার দিনে পথ হারায়নি!

কিন্তু রাজু ফিরবে কী করে?

হাঁটতে হাঁটতেই তিন মাথাঅলা একটা গলির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ ঠিক তক্ষুনি জ্বলে উঠল পথের আলো।

ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রাজু। বইয়ের ব্যাগটাকে ভীষণ ভারি মনে হচ্ছে। নাড়িয়ে চাড়িয়ে ঠিক করে নিল পিঠের ওপর।

হঠাৎ ঠিক তক্ষুনি, একটা গান ভেসে এল সামনের বাড়িটা থেকে। যে গাইছে, একেবারে ছোটোপিসির মতো গলা তার। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাইছে। ছোটপিসি যে গানটা গায় সেই গানটাই তো সে গাইছে।

রাজুর কান্না পেল আবার। ফুঁপিয়ে উঠল এবার।

তারপর কী যেন মনে হতেই এক ছুটে রাজু এসে দাঁড়াল সেই

বাড়িটার সামনে। দরজা একটুখানি ফাঁক ছিল।

রাজু ছুটে গিয়ে দাঁড়াতেই 'কে?' বলে, উঠে এল ছোটপিসির মতো গানগাওয়া সে।

রাজু তার মুখের দিকে তাকাল। চোখ মুছল দুহাতে। সে দেখতে এক্কেবারে ছোটপিসির মতো।

'এ কী, কে তুমি…' সে বলল অবাক গলায়।

'আমি বাড়ি যাবার পথ হারিয়ে ফেলেছি।' রাজু মাথা নীচু করে বলল।

'সে কী, কী করে পথ হারালে?' আরো কাছে এল সে। তার গায়ের সুন্দর গন্ধটুকু আরো ভালো লাগায় ভরে দিল রাজুকে।

'রাস্তা খারাপ বলে বাসটা ঘুরে আসছিল। খারাপ হয়ে গেছে রাস্তায়—' ফুঁপিয়ে উঠল রাজু।

'তাতে ভয় পাবার কী আছে? তোমার বাড়ির রাস্তার নামটা বলো আমায়; আমিই পৌঁছে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানাটা বলে দিল রাজু।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ছুটে ভেতর থেকে ছোট রঙিন একটা ছাতা নিয়ে এসে সে বলল 'চলো।'

পথে নামল রাজু আর সে। এখন বৃষ্টি-আলো-পাথর, জমে-থাকা জল, সব ভালো লাগছে রাজুর। বৃষ্টির মধ্যে, আলোর মধ্যে তার গায়ের সেই সুন্দর গন্ধটুকু যেন ছড়িয়ে পড়েছে। বুক ভরে রাজু সেই গন্ধটুকু নিল।

খানিকটা এগিয়ে এসে রাজুকে নিয়ে একটা রিক্সয় উঠে পড়ল সেই ছোটপিসির মতো সে।

ইস, ভাগ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল রাজু! মনে মনে কথাটা ভেবে রাজু একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটপিসির কথা ভেবে নিল।

'তোমার নামটা বললে না তো।' সে এবার শুধাল আস্তে আস্তে। রিক্সর টুং টুং শব্দের সঙ্গে তার কথাটা যেন একাকার হয়ে গেল। কাঁটা দিয়ে উঠল রাজুর শরীরে।

নিজের নামটা বলল রাজু।

তার সঙ্গে আরো অনেক গল্প হল যেতে যেতে। ছোটপিসির গানটাই যে সে গাইছিল সে কথাটাও বলে ফেলল রাজু।

রাজুর ছোট হাতখানা তুলে নিয়ে সে বলল, 'এসব শুনতে ভারি মজা লাগছে আমার।'

রিক্স এ গলি ও গলি করে কখন যে ম্যাজিকের মতো রাজুদের গলিতে এসে পড়ল, রাজু তা বুঝতেই পারল না।

অবাক হয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছি না কী করে চলে এলাম বাড়ির গলিতে। তুমি ম্যাজিক জানো নাকি?'

'একটু জানি। না হলে তোমার ছোটপিসির গানটা তখন গেয়েছিলুম কী করে?' সে হাসল।

রাজু অবাক হয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাকাল তার দিকে।

বাড়ির দোতালায় ছোটপিসিই ঝুঁকে আছে। আলো জ্বলছে বাইরে—

রাজু যে কী করবে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এখন কেমন আশ্চর্য লাগছে সব কিছু।

বাড়ির নিচে এসে রিক্স থেকে নামতেই ছোটপিসি ঝুঁকে পড়ে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে খুশিতে বলে উঠল, 'ঐ তো, এসে গেছে রাজু...'

মা, ছোটকাকু, বাবা ছুটে এসে ঝুঁকে পড়লেন রেলিং থেকে।

'আমি এবার চলে যাই।'

সে বলল ওপরের দিকে তাকিয়ে।

'না না, সবার সঙ্গে দেখা করে যেতেই হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল রাজু।

'ওরা তো কেউ আমায় চেনে না।' সঙ্গে সঙ্গে বলল সে।

'আমি চিনিয়ে দেব—' বলে ছুটতে ছুটতে তাকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল রাজু। রিক্স দাঁড়িয়ে রইল। মা এগিয়ে এলেন দরজা খুলে।

'সঙ্গে কাকে এনেছিস?' অবাক হয়ে শুধালেন মা।

'বলছি।'

বলে গর্‌গর্ করে সব বলে গেল রাজু। তারপর ওয়াটারপ্রুফটা ছুঁড়ে দিল ছোটপিসির দিকে। ব্যাগটা পিঠ থেকে খুলে নিয়ে দিল মার

হাতে।

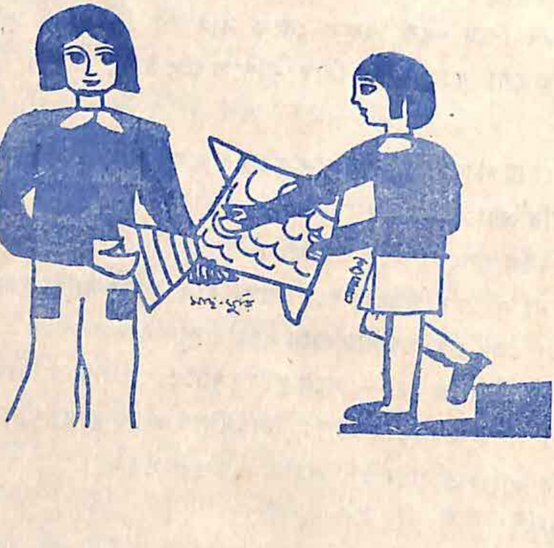
মা তার হাত ধরে বললেন, 'উফ্, যা করেছ তুমি! রাজু যে কী করত তোমায় না পেলে! তুমি এসো। আজ থেকে তুমিও না হয় রাজুর পিসি হয়ে গেলে।'

ছোটপিসিও খুশি খুশি গলায় বললো, 'এসো না ভেতরে।'

রাজুর দিকে তাকিয়ে একবার হেসে, ছোটপিসির মতো সে ভেতরে চলে গেল।

খুশিতে রাজুর কি ইচ্ছে হচ্ছে রাজু তা নিজেই বুঝতে পারছে না।

ইস্, ভাগ্যিস আজ বৃষ্টি নেমেছিল আর বাসটা খারাপ হয়ে থেমে পড়েছিল পথে!



যাচ্ছেতাই ছড়া

ভাস্কর বসু

অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে—
কলেজ কি ইশকুল,
আমটি আমি খাব পেড়ে,
না প'ড়ে বিলকুল।
ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে—
পরীক্ষায় বা ক্লাসে।
ঈগলপাখি পাছে ধরে
নতুন সিলেবাসে।
উট চলেছে মুখটি তুলে
পারমিটে-টেণ্ডারে,
দীর্ঘ উ-টি আছে ঝুলে
নির্দলীয়ের ঘাড়ে!
ঋষি মশাই বসেন পূজায়
হুড়ো-বিদ্যায় পেকে
Liquor যেন ডিগবাজি খায়,
সন্ধেবেলায় লেকে।
একাগাড়ি খুব ছুটেছে
নাম হল এস-বাস,
ঐ দেখো ভাই চাঁদ উঠেছে
সিনেমায় সাবাস!
ওল খেয়ো না ধরবে গলা,
আনাজেরও সেই হাল,
ঔষধ খেতে মিছে বলা,
কারণ তা ভেজাল॥



ফটোগ্রাফার
প্রদীপ কুমার মিত্র

"চুপচাপ বোসো দিদি—
একদম নোড় না,
উহুঁ উহুঁ, হাত নিয়ে
ও রকম করো না ।
মুখ তুলে হাসো দেখি,
ঠিক কর চুলটা,
আরো কাছে সরে এসো—
টেনে আনো টুলটা।
ঐ দেখ ! বার বার
মাথা কেন নড়ছে ?
জানো না কি তার ফলে,
কতো বাধা পড়ছে !
ডান দিকে হেলে বোসো,
ঠিক কর শাড়িটা,
বাঁকা চোখে আর্ট নিয়ে,
দেখ ঐ বাড়িটা ;
এইবার রেডি হও—
ফিক্ করে হাসবে,
তবেই তো ক্যামেরায়
ভালো ছবি আসবে।"

ক্লিক্,—"দারুণ হয়েছে। না রে ?
একটুও নড়িনি।"

"ঐ যাঃ ! ক্যামেরায়
ফিল্মটাই ভরিনি।"

বৈজুর এক্সপেরিমেণ্ট

দীপংকর লাহিড়ী

এক

সামন্তমশাই যেতে যেতে খাটমলদের মন্দিরটা দেখালেন। খাটমল নামটা শুনে চমকে উঠল সবাই। কি যেন মানে হয়না কথাটার!

রামপুরহাট পার না হতেই আবার খাটমলের নামে একটা প্রাইমারী স্কুল। তবে সেটা নাকি এবার ডবল প্রোমোশান পেয়ে একলাফে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়ে যাচ্ছে!

মাইল দুই যেতে আবার একটা বাড়ী, মাথায় লেখা 'মৎকুনিয়া খাটমল চ্যারিটেব্‌ল্ ডিস্‌পেন্‌সারী।' ভীমগড় না কি যেন নাম জায়গাটার!

এত দান খয়রাত, তবু এ নামে তো কোনো শিল্পপতিকে মনে পড়ছে না কারো!

জিজ্ঞাসু মুখে সামন্তমশাই-এর দিকে তাকাতে উনি বললেন, "অবাক করলেন বাবাজীরা! কি প্রতাপ ছিল জীবৎকালে! লোকে কথায় বলত বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়! আরে আমরা যে স্বচোখ্‌খে দেখেছি খাটমলসাহেব এক্‌স্‌মাস্‌ কাটাতে এলে সেবছর নিউইয়ার্‌স্‌ডেতে বরফ পড়ত। হবে না! তাবড় তাবড় সাহেবসুবোর আগমন ছিল যে!"

টিপ্পনী কাটল প্রদীপ্ত, "তবে তো বড় জাঁহাবাজ সাহেব ছিলেন আপনাদের এই খাটমল!"

সামন্ত গাড়ীতে উঠে অবধি চড়ুইপাখির মতন বকবক করছিলেন, প্রদীপ্তর কথায় যেন ব্রেক খেলেন। স্বমিত সামলাতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু খাটমলের বসতবাড়ীটা কোথায়?" উনি অন্যমনস্কভাবে বললেন, "এসেই যখন পড়েছেন সবই দেখবেন।" সামন্তকে আর খাটমলের কথায় নামান গেল না, কারণ ততক্ষণে আমরা যুগলকিশোরদের বাড়ী পৌঁছে গেছি।

ত্রিবেদীসাহেব, মানে মিস্টার রামকিঙ্কর ত্রিবেদী, বার-এট-ল, সামনের বাগানে পায়চারী করছিলেন। লম্বায় ছফুট, মানানসই ছাতি, কলারতোলা পুরু গেঞ্জী, মুখে পাইপ। কে বলবে সত্তর পিছনে ফেলে এসেছেন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার আগে। তবে ব্যাকব্রাশ করা চুলে কালের ছোপ ধরেছে। ঘনভ্রূজোড়া চোখের উপর এক আঙুল উঁচু ঝুলবারান্দা তৈরী করে এমন এক নীরেট ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ দিয়েছে যে ছেলের চিঠি আগে থাকতে না দেওয়া থাকলে এ ব্যক্তির সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজেদের পরিচয় পেশ করতে রীতিমত নির্বাচনে দাঁড়াতে হত।

মালি গেটটা খুলে দিতেই উনি যেখানে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে রাইট অ্যাবাউট টার্ন্ হয়ে বললেন, "মোষ্ট হার্টি ওয়েলকাম টু ইউ অল! তারপর, রাত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? ষ্টেশনমাষ্টারকে অবশ্য বলাই ছিল।"

চরণ ততক্ষণে মালপত্র সব নামাতে শুরু করেছে।

ত্রিবেদীসাহেব বললেন, "হ্যাভ এ বাথ ফার্ষ্ট। গরম ট্যাপওয়াটারে স্নান করে নাও, ট্রেণজার্নির পর ভালই লাগবে। তারপর চায়ের টেবিলে শুনব তোমাদের কথা।"

বাড়ি বটে একখানা। দোতলার দক্ষিণদিকে একটা বড় ঘরে আমাদের ব্যবস্থা হয়েছে। একতলার বৈঠকখানা, তারপর এক বিশাল করিডর পার হয়ে কার্পেটমোড়া কাঠের সিঁড়ি। বৈঠকখানায় প্রমাণ মাপের সব অয়েলপেইন্টিঙ, বোধহয় পূর্বপুরুষদের। করিডোরের গ্রুপ ফটোগুলোর মধ্যে দুটো দুইযুগের ভাইসরয় গবর্ণরের সঙ্গে তোলা। দেয়ালগুলো রঙ মিলিয়ে ডিসটেম্পার। সিঁড়ির দুটো চাতাল, দুটোতেই কারুকাজকরা ছকোণা টেবিল, টেবিলের উপর মীনাকরা মোরাদাবাদী ফুলদানী। কালো টেবিলে সাদা সূক্ষ্ম কারুকাজ—সুমিত বলল মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের।

দোতলায় এসে একপলক বাইরে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। দূরে 'রয়্যাল ব্লু' রঙ-এর আকাশে সাদা সাদা মেঘের পুঞ্জ, তাতে আবার কে যেন আলতো করে পেন্সিল বুলিয়ে কোথাও ভেড়া কোথাও ভালুকের চেহারা মক্সো করেছে। নীচে আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, ফাঁকে ফাঁকে বাদামী খোয়াই। বেশ ক'টা গরু এদিক

ওদিক চড়ে বেড়াচ্ছে।

ঘরের লাগোয়া বাথরুম, এক এক করে সারতে হবে, নিসর্গশোভা তাই মুলতবী রইল।

সওয়া আটটা নাগাদ নীচে নেমে দেখি ত্রিবেদীসাহেব প্রাতর্ভ্রমণ সেরে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করছেন।

সাহেব দেখি আমাদের সবারই সব খবর জানেন, মুখগুলোই যা অচেনা ছিল। বিলাতে পড়াশুনা. বিজ্ঞানের ভাল ছাত্র ছিলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল ব্যারিষ্টার হয়ে এসে কলকাতায় বসেন। তবে তা আর হয়ে ওঠেনি। বরং সখ করে বরোদায় ক'বছর ফিজিক্স পড়িয়েছেন। বাবা মারা গেলে জায়গাজমি আর ব্যবসার তাগিদে দেশে ফিরে পাকাপাকিভাবে বসতে হল।

সওয়া ন'টা নাগাদ বললেন, "বাইরে যাব ক'দিনের জন্ম। জীপটা রইল, কোথাও যেতে চাইলে সামন্তকে বল, ও সব ব্যবস্থা করে দেবে।" স্বরূপ কি একটা বলতে গেল, উনি হাসিমুখে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে' খন। তোমরা তো আছোও ক'দিন।"

দুই

সামন্ত অবশ্য সব ব্যবস্থাই করে দিলেন।

অজয়ের উৎসাহে একদিন শিকারে বেরোন গেল। মোর নদীর ধারে যাব। জঙ্গল তেমন ঘন নয়। সামন্তমশাই বলেছিলেন, "খরগোস টরগোস আছে, হরিণও আছে, তবে মারতে মানা। আর আছে হায়না। ওবিশ্যি পাখি পাবেন প্রচুর!"

দুমকার রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে হয়। মাইল দুই যেতে এক বিশাল প্রাসাদ, চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এপাশে একটা মস্ত সাইনবোর্ড ঝুলছে। সামন্ত ফিসফিস করে বললেন, "ঐ দেখুন খাটমল সাহেবের বাড়ি!"

প্রথমে তেমন কিছু মনে হয়নি। যেন একটা পোড়ো বাড়ি, তার

এপাশের দেয়ালে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাটল। জীপ ওটাকে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল। তখন চোখে পড়ল বাড়িটার এক রহস্যময় বীভৎস চেহারা। অসমান সস্তা কাঁচের আয়নায় প্রতিবিম্ব যেমন বিকৃত দেখায়, বা মোমবাতি বেশ কিছুক্ষণ জলার পর গলে গলে পড়ে যেমন এক কিম্ভূতকিমাকার রূপ নেয়, বাড়িটার আগাপাশতলা যেন ঠিক তেমনি দুমড়ানো মোচড়ানো। ব্যালকনি, কার্নিশ, জানলার উপরে চটকদার কারুকাজ সবই আছে, কিন্তু বর্তমান বাড়িটার ত্রিভঙ্গ মুরারী চেহারা যেন সেসবকে দাঁত বার করে মুখ ভেঙাচ্ছে। এতবড় প্রাসাদটাকে সস্তার টিনের কৌটার মতো দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে যে অমানুষিক শক্তি দরকার তা অনুমান করতে সেই ভরদুপুরেও আমাদের গা ছমছম করে উঠল।

সামন্ত আগেই নেমেছিলেন। এ ক'দিনে যতবারই দেখা হয়েছে বাক্য-ব্যয়ে তাঁর কার্পণ্য দেখিনি কখনো। কিন্তু তাঁকেই এখন দেখলাম বাড়িটার পরিবেশের মতই স্তব্ধ হয়ে যেতে।

ঘুরে আমরা ওপাশে গেলাম। বিরাট কালো সাইনবোর্ডে যাতে বহুদূর থেকে দেখা যায় সেভাবে একটা মড়ার মাথা আর তার নীচে আড়া-আড়িভাবে দুটো হাড় সাদা রঙ-এ আঁকা, যেমন থাকে স্পিরিটের বোতলে কিংবা হাইটেনশান ইলেকট্রিক লাইনের তেঠেঙ্গা পোষ্টের গায়ে। বোর্ডটা পুরাণো রঙটঙ উঠে গেছে। কাছে গেলে হয়তো কিছু উদ্ধার হত, কিন্তু প্রস্তাবটা কেমন এক আধিভৌতিক ভয়ে ঠিক কারো মনঃপুত হল না। তবে দেখা গেল কুড়ি পঁচিশ লাইনের বিস্তৃত বক্তব্যের শেষে ড্যাশ দিয়ে লেখা—By Order of The District Magistrate.

মিনিট কুড়ি বোধ হয় ছিলাম ওখানে। কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ। এর পরে উৎসাহে যেন কেমন ড্যাম্প লেগে গেল। মোর নদীর উঠে-পড়া চড়ার কাশবনে পাখির কমতি না থাকলেও কেন যেন অজয়ের একটা গুলিও লাগল না সেদিন। শেষমেষ আধ ঘণ্টা বাদে আমরা রওনা হলাম। সামন্ত একবার আক্ষেপ করলেন, দুর! অন্যপথ দিয়ে গেলেই হত!

সোনাপেটে ফিরে দেখি বাড়িময় ব্যস্ততা। ত্রিবেদী সাহেব তাঁর ট্যুর সেরে সবে ফিরেছেন।

আমরা ঘরে পৌঁছতে চরণ চা নিয়ে এল। স্বরূপ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা চরণ ! দাদাবাবুর মা নেই ?" চরণ বেশ অবাক হয়ে বলল, "জানেন না! মা তো মারা গেছেন অনেকদিন !" চরণের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি আমাদেরই ঘরের দেয়ালে মালাঝোলানো অয়েল পেইন্টিঙ। মারা তো সবাই যাবে, কিন্তু চরণের ভাবে মনে হল এ যেন তেমন নয়। অন্য কিছু !

তিন

সন্ধ্যায় ত্রিবেদী বসলেন আমাদের নিয়ে ওঁর ঘরে। বললেন, "তোমরা শুনলাম খাটমলের বাড়ী দেখতে গিয়েছিলে আজ?"

অজয় একটু আমতা আমতা করে বলল, "না, ঠিক ওখানে নয়, শিকারে যাচ্ছিলাম মোর নদীতে। পথে বাড়িটা চোখে পড়তে আর কিছু হল না।"

অন্যমনস্কভাবে উনি বললেন, "না হবারই কথা!" একটু নীরব থেকে বললেন, "তোমরা তো শুধু এফেক্টটাই দেখলে, আর আমরা দেখেছিলাম ইভেন্ট।"

বৈঠকখানা ঘর নিস্তব্ধ। শুধু মেহগিনি কাঠের ব্লেড লাগানো দৈত্যাকার সিলিঙ ফ্যানটা ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে শেষ শরতের গুমোট কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। ত্রিবেদীসাহেবের রহস্যময় মন্তব্য তাকে করে তুলেছে আরো দুর্বহ।

বোধহয় মিনিট পাঁচেক আমাদের ত্রিশঙ্কুর মত নিরলম্ব ঝুলিয়ে রেখে উনি শুরু করলেন, "সেই চৌত্রিশ সালের পয়লা জানুয়ারী। আমি, আই. সি. এস. ফার্গুসন, কনজারভেটর অব ফরেষ্ট্স্ ব্যানার্জী, বিজনেস টাইকুন সরকার আর বাজপাই। এছাড়া ছিল আরো কত। খাটমলের পাবলিক স্কুলে পড়া ছেলে তার এক্সপেরিমেন্ট দেখাতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্য হল নিজে, তারপর যন্ত্রপাতিসমেত তার টেবিল, তারপর খাটমল, তার ভাই ভাইপো একের পর এক।

অবাক হয়ে শুনছি। খাটমলরা নাকি সাতপুরুষের ব্যবসায়ী। জগৎশেঠের সঙ্গে নাকি এদেশে আসে। নবাব প্যালেসে নাকি ঘি সাপ্লাই দিত। তাদেরই উত্তরপুরুষ এই মৎকুনিয়া ঘি-এর ব্যবসায়ে আর বিশেষ নাফা হয়না দেখে সামান্য সংস্কার করে রাতারাতি ঘৈ-এর ব্যবসা ফেঁদে বসল।

ঘৈ-এর কথায় মনে পড়ল শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়ার কথা। ত্রিবেদী 'নড্' করলেন, খাটমল নাকি বাটপারিয়ার 'কাজিন ব্রাদার', ফ্রম মেটারনাল সাইড!

ডুমকা থেকে আসত ঘি আর ধাপা থেকে চর্বি। কোথায় প্যাকিং হত জানি না, তবে ফিনিশ্‌ড্ প্রোডাক্ট টিনে ভর্তি হয়ে বিশুদ্ধ গব্যঘৃত নামে বিক্রী হত সেযুগের বড়বাজারে, সের সওয়া ছটাকা।

সেই ব্যবসা থেকেই খাটমলের বাড়বাড়ন্ত। মৎকুনিয়া অবশ্য খুব করিৎকর্মা লাভের সাড়ে সাত পারসেন্ট নাকি ধরা থাকত চ্যারিটির জন্য।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ত্রিবেদীর। বললেন, যাক, এই করে তো রায়সাহেবটা হল। বোঝা গেল, রায়সাহেব হতে না পারার আঘাতটা তাঁর ভালই লেগেছিল।

ওদিকে বাড়ির আর সবাই তো সেই একই আছে। বড়ভাই ক্ষেতী করে, ফুফার মুদির দোকান, এইসব। রায়সাহেব হবার পর কারো কারো কাছে মৎকুনিয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু দেখতাম ছোটভাইটাকে একটু একটু করে পালিশ নিতে, রায়সাহেব জ্যাঠার আনুকূল্যে ছেলেটার যদি কোনো গতি হয় তাই ভেবে।

তবে মৎকুনিয়া উঠে পড়ে লাগল নিজের ছেলেটাকে এনামেল করতে। তখন আর শুধু ঘৈ নয়, আরো কত কি জুটেছে, সম্ভবত বিদেশেও যাচ্ছে কিছু কিছু প্রোডাক্ট। ছেলে প্রথমে গেল কলকাতায়, তারপরে কোন এক পাবলিক স্কুলে।

আমি তখন বরোদায় পড়াই। মাঝে মাঝে এদেশে এলে দেখা হয় বাপের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গেও। আমার কলেজ আর ওর স্কুলে একই সময় ভ্যাকেশান পড়ে। ছেলেটার দেখি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও খুলছে।

বাপের মত আকাট না, কথা বলে ভালই লাগে।

একবার ছুটিতে এসেছি, মৎকুনিয়ার ছেলে বৈজু আমাকে ওর এক্সপেরিমেন্ট দেখাতে নিয়ে গেল। কাঁচের কুঁজো তো দেখেছ, সেরকম একটা পাত্র। মুখটা কর্ক দিয়ে সিল করে আঁটা, তার মধ্যে একটা বাঁকানো নল বসিয়ে দিয়েছে। পাত্রটায় জল ভরে ওপর থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। নীচে স্পিরিট ল্যাম্প বসাতে একটু পরে বাঁকানো নল দিয়ে ফুর ফুর করে স্টিম বার হতে শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ধাক্কা লেগে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে লাগল ফ্লাস্কটা।

খুব ভাল লাগল দেখে। ছেলেটা তবে আমার কাছ থেকে মি'র বুক অব টেন থাউজ্যাণ্ড থিঙস নিয়ে পড়েছে ভাল করে।

ক'মাস পরে পুজার ছুটিতে এসে দেখি ছেলের মাথায় নতুন ব্রেইন ওয়েভ খেলছে। বলল, আচ্ছা ওটাকে মডিফাই করে যদি একটা চাকার মত করি? কাঁচেরই রইল! একটা হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসের চারিদিকে চাকার মত ঘুরবে। ওমা, দুদিন পরেই এসে বলে খুব ফাইন বল বেয়ারিঙ বসিয়ে দেবে, দেখাই যাক না কত জোরে ঘোরে।

পরে বুঝলাম ছেলেটার মতলব অন্য। চাকার মত কাঁচের পাত্রটার মধ্যে রেখে দেবে ছোট্ট একটা পাথরের টুকরো। বলে, "পাত্রটা ঘুরলে তার মধ্যের সব জিনিষকে টানবে কেন্দ্রের দিকে। তখন ঐ ছোট পাথরের টুকরোটার উপর গ্র্যাভিটেশনের ফোর্স যাবে কমে। চাই কি গ্র্যাভিটেশন পুরোপুরি নিউট্রালাইজডও হয়ে যেতে পারে।"

আমরা তো অবাক। বলেন কি ভদ্রলোক! স্বরূপ বলল, "সেই চৌত্রিশ সালে!"

ত্রিবেদী যত্ন করে পাইপ ধরালেন, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "তবে আর বলছি কি! যা ওরা আমেরিকা রাশিয়ায় বসে করেছে পঞ্চাশের পর খাটমলের ছেলে তাই করতে চেয়েছিল মহাযুদ্ধের আগে।"

এরপর যেবার এলেন ত্রিবেদী, শোনেন খাটমলের ছেলের এক্সপেরিমেন্টের জন্য নাকি নানাধরণের যন্ত্রপাতি আসছে, আর সেসব মাপজোখ মত মিলিয়ে নেবার জন্য রয়েছে একজন পাশকরা ইঞ্জিনীয়ার। মিসেস

ত্রিবেদী স্বামীকে খবরটা দিয়ে বলেছিলেন, কি খুড়োর কল যে করেছে ভেজালদারের ছেলে! সত্যি টাকা থাকলে কি না হয়!"

তা টাকা আর শেষরক্ষা করতে পারল কই!

"সেই চৌত্রিশ সালে নতুন বছর উপলক্ষ্যে পার্টি। সন্ধ্যায় তো এল সবাই। দেখি বৈজু একতলায় তাদের বিশাল হলঘরের মধ্যিখানে একটা বিরাট টেবিলের উপর কি একটা কিম্ভূতকিমাকার যন্ত্র বসিয়ে রেখেছে। আমাকে দেখে হাসল একটু। কাঁচের চাকাটাই চিনতে পারলাম শুধু, তার মধ্যে তলার দিকে পড়ে আছে ছোট্ট একটা টুকরো লুমিনাস পেইন্ট লাগানো। যাতে অন্ধকারেও তোমরা যাকে রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি বল, তার ডায়ালের মত জ্বলে।

"সবাই বসতে বড় আলোগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল। অবশ্য সুইচ-বোর্ডের কাছে মোতায়েন রইল একজন দরকার হলেই আলো জ্বালার জন্য।

"বৈজু একবার বাবার দিকে তাকাল, তারপর বলল, এবার তবে ডেমনস্ট্রেশান শুরু করি? ফার্গুসন পাইপ ধরিয়ে ফুকফুক করে ধোঁয়া ছাড়ছিল, সেই মাথা নেড়ে সিগন্যাল দিল।

"একটা দেশলাই জেলে বার্ণার ধরাল বৈজু। লোকজন একটু নীরব ছিল। ধীরে ধীরে আবার দুএকজনের কথাবার্তা শুরু হল। সবারই অবশ্য একটা চোখ যন্ত্রের দিকে। একটু বাদে জল ফুটতে শুরু করল। কাঁচের চাকাটা ঘুরছে, সেই সঙ্গে সেই পেইন্ট লাগানো টুকরোটা একটা আলোর বৃত্ত তৈরী করে ঘুরছে ঠিক কালীপূজার চরকির মত। ঘোরার বেগ ক্রমেই বাড়ছে, বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে।

"হঠাৎ দেখি বৃত্তটার ব্যাস যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে। আমরা সবাই একদৃষ্টে দেখছিলাম। ফলে হঠাৎ ব্যাস কমতে শুরু করতেই সবারই কেমন যেন গাটা শিরশির করে উঠল। আর তাকিয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে, ঘোরার বেগে মাথা ঝিমঝিম করছে। অপার্থিব ভীতিটা তার সরু সরু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন উপস্থিত সবার শিরায় শিরায় প্রসারিত করছে।

সবাই যেন মনে মনে আশঙ্কা করছে, এই বুঝি ফাটল চাকাটা!

"অন্যমনস্কভাবে চাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম

জলন্ত বৃত্তটা ছোট হতে হতে একসময় চাকার কেন্দ্রের সঙ্গে মিশে গেল আর তৎক্ষণাৎ সেটা অদৃশ্য হল। ঘটনাটা এমনি আকস্মিক ঘটল যে সামনের সারিতে গুঞ্জন শুরু হল। যে লোকটা সুইচবোর্ডে ডিউটিতে ছিল সে ভয় পেয়ে আলোগুলো সব জেলে দিল। আর তখনি নজরে এল ঘুরন্ত চাকাটা যেন ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে।"

গুঞ্জন ততক্ষণে চাপা গোলমালে পরিণত হয়েছে। সামনের সারির দুচারজন উঠে পড়ি পড়ি করেও চক্ষুলজ্জার খাতিরে পারছে না, কারণ বৈজু তখনো টেবিলের নীচে ব্যাপারটার হেতু অনুসন্ধানে ব্যস্ত। সেই অবস্থায় সবাই চাকাটাকে পাতলা হতে হতে পুরোপুরি মিলিয়ে যেতে দেখল।

চাকাটা অদৃশ্য হতে এবার সবার নজর পড়েছে টেবিলের উপর। দেখা গেল দ্রুত টেবিলটা উপরদিক থেকে বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। ওর উপর তখন আর যন্ত্রটন্ত্র কিছু নেই, সব অদৃশ্য হয়ে শুধু চোখ ধাঁধানো উজ্জল এক স্বচ্ছ ধোঁয়া। একটা অস্বাভাবিক গরম হল্কা পলকের জন্য আমাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ শোনা গেল বৈজুর আর্ত চীৎকার, সেভ মি, সেভ মি! —আর কিছু না। সবাই দেখল যেন এক অদৃশ্য চাকার উপর দিয়ে বৈজুর দেহটা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে শুরু করল। মাত্র ক'সেকেণ্ড, তারপরেই সেটা কনভেয়ার বেল্টের মত পাতলা হয়ে এক বৃত্ত হল, তারপর বৃত্তটার ব্যাস ছোট হতে হতে ভুস করে মিলিয়ে গেল। মংকুনিয়া ছেলের 'সেভ মি!' শুনেই ছুটে এসেছিল, ছেলে পুরো অদৃশ্য হবার আগেই সেও হয়ে গেল কনভেয়ার বেল্ট।

পাইপ নিবে গিয়েছিল। ত্রিবেদী সেটা জালতে গিয়ে একটু দম নিলেন। তারপর বার দুই ধোঁয়া ছেড়ে আবার শুরু করলেন, 'ততক্ষণে আমাদেরও কেমন যেন টানছে সেদিকে। একবারতো পিছন ফিরে দেখলাম কেউ ঠেলছে কিনা। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, সামনে ফিরতেই দেখি মংকুনিয়া হাওয়া।

"এবার আর সামনের সারি নয়, সারা হলে শুরু হল তাণ্ডব। ফার্গুসন বোধহয় ভেবেছিল বউকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। একে আই. সি এস. তার উপর সাহেব। কিন্তু তখন কে বা সাহেব কে বা নেটিভ। বেচারা মেমসাহেব ঠেলা ঠেলিতে পড়ে গেলেন সকলের পায়ের তলায়।

"শেষে আমিই ওকে তুলে দিলাম। ফলে আমাদের হয়ে গেল দেরী। বেরোবার মুখে আমার স্ত্রী একবার পিছন ফিরে দেখলেন খাটমলের শেষ বংশধর ওর আপষ্টার্ট ভাইপোকে সেই উজ্জল নীলচে ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে।

"ছুট ছুট ছুট! আমার এ বাড়ী তো নূতন, আগের বাড়ী ছিল একেবারে খাটমলদের বাড়ীর লাগোয়া। যেভাবে সব অদৃশ্য হচ্ছে, বাড়ীতেই বা থাকি কোন ভরসায়! কোনোরকমে অর্নামেন্ট্‌স্‌ আর ভ্যালুয়েবল্‌স্‌ সব একটা অ্যাটাচিতে পুরে প্রথম এলাম রামপুরহাটে। বড় গাড়ী সেখানে থামেনা, রাঁচী প্যাসেঞ্জার কখন বেরিয়ে গেছে, সকালের আগে গাড়ী নেই কিছু। শেষে গেলাম বোলপুর। গুরুদেবের খাতিরে সব গাড়ীই থামে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এক্সপ্রেসটাও ধরতে পারলাম না। শেষে মোটা বকশিস কবুল করে নৌকোতে অজয় পার হয়ে বর্ধমান থেকে ডুন এক্সপ্রেসে কলকাতা।

"তারপর আর কি! পরদিন দেখি কাগজে ছোট্ট করে বেরিয়েছে। বিকেলে বসুমল্লিকরা এল। ওরা রওনা হবার সময় দোতলা তেতলা অদৃশ্য হতে দেখে এসেছে। পরদিন রামপুরহাট থেকে সরকার মশাই এলেন। উনিই খবর দিলেন, টান ওপরে যতটা পাশে ততটা না। সোঁ সোঁ করে উড়ন্ত চিল শকুন টেনে নিচ্ছে যেন এক বিশাল সাকশান পাইপ। অথচ বাড়ীর বাইরের দিকের দেয়ালে তেমন কিছুই হয়নি। তবে পাশ দিয়ে গেলে কেমন যেন টানে. ভয় হয় একটু অন্যমনস্ক হলেই বুঝি খাটমলের বাড়ী কপ করে গিলে খাবে।"

শেষে নাকি বাঁচাল বিহারের সেই কুখ্যাত ভূমিকম্প। কি হল কে জানে। শুধু দেখা গেল চিল শকুন আবার ঠিক আগের মতোই হলের

উপর দিয়ে উড়ছে, দেয়ালের আগায় বসে আবার কাক ডাকছে। ডানপিটে দু'একজন সাহস করে এগোল। কই! সেই ভূতুড়ে টান নেই তো! তারপর একে একে সবাই ফিরে এল, ত্রিবেদীরাও এলেন।

ঘর নিস্তব্ধ। ত্রিবেদীর পাইপ বোধহয় নিভে গেছে।

কারো মুখের দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না।

চরণ এসে খবর দিল নৈশ আহার প্রস্তুত।

ত্রিবেদী উঠলেন, উঠতে উঠতে বললেন, "তোমরা থেকে যাও না ক'দিন। আমার এক বন্ধু আসছে, ফ্রেড উইলিয়াম্‌স্। ইমপিরিয়াল কলেজে একসঙ্গে পড়েছিলাম। শুনেছি দুবার নোবেল কমিটির কাছে নাম গেছে। সায়েন্স কংগ্রেস উপলক্ষ্যেই আসছে, তবে একটু আগে আগে আসছে একটু ঘুরে টুরে দেখবে।

চার

ফ্রেড এলেন।

বয়স ত্রিবেদীর মত না হলেও হয়েছে তো বটে। তবু সোজা হাঁটেন। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ, হেন বিষয় নেই যা নিয়ে দুচার ঘণ্টা পার করে দিতে না পারেন।

তবে এই ফ্রেডই খাটমলের বাড়ী দেখতে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ফেরার পথে শুধু বললেন, তোমার লাইব্রেরীটাতে একটা টেব্‌ল্ ল্যাম্পের ব্যবস্থা করে দিও তো রাম। আর বলে দিও, রাতে কেউ যেন ডিসটার্ব না করে।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বললেন ফ্রেড, বুঝলে রাম, ব্যাপারটা আমার ব্ল্যাক হোল বলে সন্দেহ হচ্ছে।

"ব্ল্যাক হোল? সেই হলওয়েলের?" বোকার মতো জিজ্ঞেস করে ফেলে স্মিত। লজ্জা পেয়ে গেলাম আমরা। কে জানে কলকাতার হলওয়েল মনুমেণ্টের কথা আবার উনি জানেন কিনা!

ফ্রেড হাসলেন। তারপর বোঝাতে বসলেন।

আকাশ থেকে যদি কোনো বস্তু পড়তে শুরু করে পৃথিবীর বুকে তবে

তার পতনের বেগ সেকেণ্ডে প্রায় দশ মিটার করে বেড়ে চলে। নেহাৎ পৃথিবীটা কঠিন, তাই -অনেক উঁচু থেকে পড়লেও তা মাটিতে আছড়ে পড়ে বড়জোর সেকেণ্ডে কয়েক কিলোমিটার বেগে।

ফ্রেড বললেন, "ধর, পৃথিবীটা যদি কঠিন না হত তবে পড়ন্ত বস্তুটা তলিয়ে যেতে পারত তার কেন্দ্রের কাছাকাছি, আর তার পতনের বেগ বাড়তে বাড়তে সেখানে গিয়ে দাঁড়াত কয়েক হাজার কিলোমিটারে। সূর্য, যার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের একশ' গুণ, ওদিকে অভিকর্ষের টানও অনেক বেশী, তার কেন্দ্রের তিন কিলোমিটার দূরেই তার গতিবেগ ছাড়িয়ে যেত আলোর গতিবেগকে।"

এতটা বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার বলতো, গ্যাসীয় নক্ষত্রে এরকম একটা কাণ্ড হলে কেন্দ্রের চারপাশে কি অবস্থা দাঁড়াবে!"

আমাদের নীরব মুখগুলোর দিকে চেয়ে আবার ফ্রেডই বললেন, "সত্যিই সেরকম জায়গা যদি থাকে তবে সেখানে বস্তুপুঞ্জ মিলিয়ে যেতে থাকবে। জানো তো আলোর গতিবেগ অতিক্রম করলে বস্তু আর বস্তু থাকে না, রূপান্তরিত হয় শক্তিতে!" বিজ্ঞানীরা একেই বলেন 'ব্ল্যাক হোল।' শুরুতে ব্ল্যাক হোল প্রচণ্ড শক্তি বিকীরণ করে, তারপর সেই শক্তিকণিকা-সুদ্ধ তলিয়ে যেতে থাকে সম্ভবত অন্তরালের কোন মহাবিশ্বে। সে বিশ্বে আলোর বেগই নিম্নতম গতিসীমা। আমাদের এ বিশ্বে উবে যাওয়া বস্তুগুলো ও বিশ্বে অনন্ত শূণ্য থেকে জন্মলাভ করে।"

ফ্রেডের মতো বৈজ্ঞানিকদের কাছে বোধ হয় ব্ল্যাকহোল ডালভাত, কিন্তু তাঁর বর্ণনামত তলিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখি প্রায় বৈজুর চাকার মতোই আমাদের মাথাগুলোও ঘুরে যাবার দাখিল।

সমস্যার সমাধান করে দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে সিগারেট ধরালেন ফ্রেড, তারপর বললেন, আজকাল তো প্যারাসাইকোলজির যুগ। তাই ব্ল্যাকহোলের ওপিঠের বিশ্বটাকে তোমরা যাকে বলো পরলোক, তাই ভাবতে শুরু করেছেন অনেকে। কারণ এখানে ধ্বংস হয়ে ওখানে যেমন বস্তু জন্ম নিচ্ছে ঠিক তেমনই ও বিশ্বে যা যা মরবে এ বিশ্বে তাদের জন্মাবার কথা। সোজা কথায় এই ব্ল্যাক হোল তাঁদের কাছে ইহলোক আর পরলোকের যোগাযোগ

রক্ষাকারী সাবওয়ে ।

ত্রিবেদী সাহেব সযত্নে পাইপ ধরালেন, তারপর আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বাংলায় বললেন—"ওবিশ্বি, ভূমিকম্প হয়ে একদিক থেকে ভালোই হয়েছিল। নইলে ঐ ব্ল্যাকহোল দিয়ে ও-বিশ্বের খাটমলদের ক'টা প্রোটো-টাইপ যে এ বিশ্বে আমদানী হত তা ঈশ্বরই জানেন।"

বলাবাহুল্য, ফ্রেড বাঙলা কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু অনুমান করছিলেন কিছু। কারণ চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন—হোয়াট হোয়াট !

খুব গম্ভীর মুখ করে বললেন রাম কিংকর—ওসব তুমি বুঝবে না ফ্রেড, ও আমাদের অধ্যাত্ম দর্শণের ব্যাপার স্যাপার।

জঙ্গলের গপ্পো

মধু বসু

ক'দিন আগে আমরা দুই বন্ধু কলকাতা থেকে গিয়েছিলাম সেই রয়েল বেঙ্গলের দেশ 'সুন্দরবনে'। ক্যানিং বন্দর থেকে লঞ্চে করে মাতলা, পুরন্দর, বিদ্যানদী পার হয়ে পৌঁছলাম গোসাবায়। সেখানে আরও ক'টি জেদী ও সাহসী বন্ধু জুটে গেল আমাদের সঙ্গে।

আমরা একটা ছোট নৌকো ভাড়া করে সারাদিনের খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে বন দেখতে বেরুলাম। বনদপ্তর সহজে ছাড়পত্র দিতে রাজি হলেন না। ওরা বললেন, 'বাঘের উৎপাত খুব বেড়েছে। না যাওয়াই ভাল।' আমরা নাছোড়বান্দা। বুঝিয়ে সুঝিয়ে আশ-পাশ দেখার নাম করে পারমিশন আদায় করলাম।

নৌকো তীরবেগে বিদ্যানদীর শাখা-প্রশাখা ধরে গভীর অরণ্যে এসে পড়ল। বাপ্ রে বাপ। সে কি ঘন বন। আর কি সুন্দর রূপ। সুন্দরী, পশু, ধুধুল, বাণী, গেঁও কেওড়া, কাখড়া, গরান, হেঁতাল, তরা, বকুল, ঝাউ, গোলপাতা, খোলসে, কেঁটকি ইত্যাদি কত হরেক রকমের বিচিত্র গাছ।

সোনালী রোদ্দুরে সব চিক্ চিক্ করছে। মাথার উপর গাঢ় নীল আকাশ। নদীর জলে আমরা ভাসছি। দুপাশে সবুজ বন। নিস্তব্ধ নিঝুম। ভাবো দেখি কি চমৎকার পরিবেশ।

নৌকোতে ছিলাম আমরা দশজন। আমি ও আমার বন্ধু শ্যাম ছাড়া বাকিরা হল আমাদের বন্ধু দুর্গা, ভার্গব, নির্মল, পুলিন, দীনবন্ধু, প্রতিদান ও দুজন মাঝি। এরা সকলেই গোসাবার ছেলে। প্রত্যেকেই বার তিন-চার গভীর বনে ঢুকেছে। বাঘ দেখেছে। পথঘাট চেনে। আর জানে সত্যি সত্যি বাঘের গপ্পো। শুনলে গায়ে কাঁটাদিয়ে ওঠে।

হঠাৎ নানান ধরণের আওয়াজ কানে এল। যেন হাজার হাজার মানুষের মিছিলের শব্দ। দুর্গাকে জিজ্ঞেস করলুম ব্যাপার কি?

দুর্গা বলল: এটা 'পাখিরালা'। প্রায় তিনশো সত্তর বর্গকিলোমিটার জুড়ে নানান পাখি বাস করে। এদের মধ্যে শামুকখোল, কাঁকপাখি, সাদাবক, বিলচড়, বালিহাঁস, কোঁচবক, পানকৌড়ি, কাস্তেচুড়া, গয়রাজ, মানিকজোড়, বাকচা, ডাহুক, কাদাখোঁচা, বাটাং, ঘুঘু, চিল, মাছরাঙা, কাক, ভারা, ইত্যাদি পাখি আছে।

সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প আইন অনুযায়ী, এ সব পাখিদের মারা বা ধরা একেবারে নিষেধ। এ আইনে শুধু পাখি নয়—সুন্দরবনের কোন প্রাণীকেই মারা চলে না।

এসব পাখিরা বাট-সত্তর বছর ধরে এখানে আসা-যাওয়া করছে। এরা বছরের মে-জুন মাসে বাসা বাঁধে এবং বর্ষা ও শরৎকালে প্রায় ছ'মাস এখানে বাস করে। এসময়েই এরা ডিম পাড়ে। বাচ্চা ফুটে বেরুলে তাদের কিছু বড় করে অক্টোবর-নভেম্বরে এরা আগের বাসায় ফিরে যায়। শীতকালে বেশীরভাগ পাখি বেপাত্তা হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেকে এসময় কলকাতার চিড়িয়াখানায় আড্ডা জমাতেও আসে।

গোসাপ, সাপ, কাক, বাজপাখিরা অন্যান্য পাখির ডিম ও বাচ্চা খেয়ে ফেলে ও নষ্ট করে দেয়। কখনো কখনো বাঘ গাছ নাড়া দিয়ে পাখির বাচ্চা সাবাড় করে। অরণ্যের প্রচণ্ড ঝড়জলেও ডিম বাচ্চা নষ্ট হয়।

এক একটা গাছে চার থেকে পনেরটা করে পাখির বাসা থাকে। এদের

মধ্যে শামুকখোলের সংখ্যাই বেশী। এদের ডিমগুলির ওজন পঁচাশ গ্রাম পর্যন্ত হয়।

আগন্তুক পাখিরা বাণী, গরান, গেঁওয়া গাছের মগডালে বাসা বাঁধে। এরা নিরীহ ও ভীতু। মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এরা স্যাঁত সেঁতে কাদা জলাজায়গাতে বাস করতে ভালবাসে; শামুক, মাছ খায়। এদের মধ্যে গয়রাজ পাখি জলে ডুবে সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে। ভাবতে পারো এই পাখি ওজনে পাঁচ কেজির মতো হয়। আর শকুনের চেয়েও বেশী উঁচুতে ওড়ে।

বন দপ্তরের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নৌকা বাঁধা হল। প্ল্যাটফর্ম প্রায় চারতালা উঁচু। পাখিদের দেখার জন্যই এ ব্যবস্থা। আমরা তরতর করে ওপরে উঠে এলাম। তোমরা কল্পনাই করতে পারো না যে কত পাখি। পাখি আর পাখি। গাছের মাথা বোঝাই। মাঝিও আমাদের সঙ্গে উঠে এসেছে।

মাঝি বল্ল: বাবু একটা মজা দেখুন।

বলেই 'কুয়া কুয়া' করে লম্বা এক ডাক ছাড়ল। সারা বনময় সে ডাক ঘুরপাক খেতে লাগল। তারপর দেখি পাখিগুলি ঝাঁকেঝাঁকে শ'য়ে শ'য়ে আকাশে উড়ছে। কি অদ্ভুত দৃশ্য! সূর্য ঢেকে গেল। আকাশ ছেয়ে গেল।

মাঝি বলল, 'বাবু আর থাকা ঠিক নয়। চলুন নৌকোয় যাই। বাঘ এসে পড়া অসম্ভব নয়।' বুঝিতেই পাচ্ছো কেমন সাংঘাতিক জায়গা। আমরা নেমে এলাম নৌকোয়। বনের মধ্যে নদীর প্রশাখাগুলি বড় সংকীর্ণ। বাঘ লাফ মেরে নৌকোয় আসতে পারে। সাঁতরে আসাও বিচিত্র নয়। মাঝি বলল: 'সকলে সজাগ থাকবেন। আমরা আরও ভিতরে চলছি। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে'। কেমন থমথমে ভাব। দু'পাশে হেঁতালের বন। কেউ কেউ আবার হেঁন্তাল বলে। হলুদে সবুজে মেশানো হেঁতাল গাছের পাতা ঠিক খেজুর পাতার মতো। এই বনেই বাঘ বেশি ঘাপটি মেরে থাকে। চুপিসারে মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করে। গাটা ছমছম করছে। বুঝতে পাচ্ছি আমরা নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকছি! সত্যি অদ্ভুত

আকর্ষণ বনের। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে। মাঝি হাসছে। অন্য ছেলেরা অভয় দিচ্ছে।

দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মে আমরা এলাম। চারদিক নিস্তব্ধ। কথা কইলে গম্‌গম্ করছে। বনদপ্তর এখানে একটি মিঠে জলের পুকুর কাটিয়েছেন বাঘের জন্য। মিষ্টি জল খেলে বাঘের নাকি হিংস্রতা কমে। বাঘ এসে জল খায়, পায়ের ছাপও দেখলাম। দুনম্বর প্ল্যাটফর্মও এক নম্বরের মতো উঁচু। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি খালি গায়ে একটি মানুষ জাল হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্যাপার কি!

মাঝি বলল: মাছের জন্য লোকটি ঘোরাঘুরি করছে। যে কোন মুহূর্তে মানুষটাকে বাঘে নিয়ে যেতে পারে। কত মানুষ যে এ ভাবে বাঘের পেটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। মাঝি গল্প শোনাল: একবার কলকাতার জনকুড়ি ছেলে নিয়ে এখানে এসেছিলাম। ছেলেগুলি বড্ড পাজি ছিল। চেঁচামেচি হই হট্টগোল করতে করতে এল, 'বাঘ-ফাঘে কিস্যু করতে পারবে না'···ছুরি বার করে ওরা বল্ল, 'বাঘ এলে সোজা পেটে ঢুকিয়ে দোব। আমার কোন কথাই শুনল না। ওরা যখন ওপরে উঠে এসেছে সে সময় দু দু'টো পেল্লাই বাঘ পুকুরের ধারে এল। জল খেয়ে ছেলেগুলোকে দেখতে দেখতে উঁচু জমিটার উপরে গ্যাট হয়ে বসল। চাক্ষুষ বাঘ দেখে ছেলে-গুলোর আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। চিৎকার ফিৎকার উবে গেল। তিন তিনজন ছেলে অজ্ঞান হল। বাকিরা জড়াজড়ি করে হরেকৃষ্ণ করছে। সে দারুণ ব্যাপার! কেবল কেঁদে কেঁদে বলে, 'মাঝিগো বাঁচাও।' আমি চুপিসারে নৌকা নিয়ে বনদপ্তর থেকে বন্দুকধারী গার্ড নিয়ে এলাম। গার্ড ফাঁকা আওয়াজ করে বাঘকে বনে ঢোকাল। তারপর বাবুরা রেহাই পেলেন। মাঝির মুখেই শুনলাম। অনেকে আবার নৌকো থেকে নেমে বনের মধ্যে ঢোকে বাহাদুরি দেখাতে। সেটাও বিপজ্জনক। বাঘেরা মানুষের গন্ধ পেলে নিঃশব্দে নৌকোকে অনুসরণ করে। নিজেদের অস্তিত্ব একেবারেই বুঝতে দেয় না। সুযোগ খোঁজে অসতর্ক মুহূর্তের জন্য। ঠিক বেড়ালের মতো ঘাপটি মেরে প্রস্তুত থাকে। শিকার নাগালের মধ্যে এলেই ঝাঁপ দেয়। একবার পেলে আর রক্ষা নেই। কথায় বলে না, 'বাঘের দেখা সাপের লেখা'।

আমরা নৌকায় এলাম। সবদিকেই দৃষ্টি আমাদের। আরও সংকীর্ণ পথে এসে পড়েছি। নদীতে ভরা জোয়ার। চরায় আটকাবার ভয় নেই এই যা। সামনের বাঁক ঘুরতেই নির্মল বলল, 'সতর্ক থাকুন। এ জায়গাটার একটা ঘটনা আছে। পরে বলবো।'

আমার ভয়টা বেড়ে গেল। বেঘোরে বুঝি প্রাণটা যায়। মুখে কারুর 'রা' নেই। দশজোড়া চোখ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। কেবল দাঁড়ের শব্দ শোনা যায়। অসোয়াস্তির একশেষ। কি হয় কি হয় ভাব। মাঝিকে নৌকা গাঙে নিয়ে যেতে বললাম। মাঝি আমার কথামতো নৌকা বেশী জলে নিয়ে এল। দুধারের তীর দূরে সরে গেল। বাঘকে এবার আসতে হলে সাঁতার দিতে হবে। নির্মলকে ইশারা করতেই নির্মল ঘটনাটা বলতে শুরু করল —

'একটা ছোট নৌকায় মাঝি সমেত বনবিভাগের দুই বন্দুকধারী গার্ড, ঐ মোড়টা, যেটা এক্ষুনি আমরা পেরিয়ে এলাম, সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। একজন নীচু হয়ে বসে, অন্যজন বন্দুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে। যে বসে ছিল তার পেছনে উঁচু কাঠের ফলার মতো কয়েকটা খোঁচা লাগানো ছিল। মোড় ঘুরতেই চকিতে এক কেঁদো বাঘ বসা মানুষটির মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খোঁচার ঘায়ে বাঘের মুখ এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। তবুও বাঘটা কামড়ে ধরল গার্ডের মাথা। ধারালো নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিল গা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মাঝি ও অপর গার্ড হকচকিয়ে গেছে। কি করবে ভেবে পেল না। হুটোপাটি করতে করতে নৌকা উল্টে গেল। তারপর জলে চারজনের মারপিট চলতে লাগল। খোঁচা খেয়ে বাঘটা কাহিল হয়ে পড়ল। বেয়োনেটের ঘা-ও কম পড়েনি। হঠাৎ বাঘটা শিকার ছেড়ে পাড়ে উঠে এসে হাঁপাতে লাগল। সেই অবসরে মাঝি নৌকা সোজা করে জখম গার্ডকে নিয়ে চোঁচা দৌড়। বাঘটা ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগল। ঐ খোঁচার জন্য লোকটা সে যাত্রায় বেঁচে গেল। লোকটা বাঁচল বটে তবে মুখের আকৃতি গেল পাল্টে। এখন তাকে দেখলে রীতিমতো ভয় লাগে।

তিনটে বাজে। গল্প বেশ জমে উঠেছে দেখে মাঝি নৌকা ভিড়াল জঙ্গলের ধারে। বাণী গাছের ডালে নৌকা বেঁধে বলল—

'একটু বিশ্রাম করা যাক।'

'এখানে ভয় নেই ?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাঝি হেসে বলল—'ভয় নেই আবার! সব জায়গায় ভয়। কিন্তু বাবু কিছু না খেলে তো আর চলা দায়।'

আমাদের কাছে মুড়ি, চানাচুর, কাঁচা লঙ্কা ছিল। সকলকে ভাগ করে দেওয়া হল। মুড়ি চিবুতে চিবুতে গপ্পো এগুল। একটি খালের কাছেই আমাদের নৌকা। ঢালু জমি নদীর চরায় নেমে এসেছে। ওদিকেই

সকলের প্রখর দৃষ্টি। সামনে হরিণ বিচরণের ধানী ক্ষেত। জায়গাটা ভারি সুন্দর।

দুর্গাকে প্রশ্ন করলাম ঃ 'বাঘ ছাড়া আর কি কি জন্তু বনে আছে?'

দুর্গা বলল ঃ 'শিয়াল, বাঘরোল, হরিণ, শূকর (বরাহ), বাঁদর, খটাস উদ (ভোঁদড়), তিলক। জলে কুমির, হাঙ্গর, আর কমোট। কমোট হাঙ্গরের থেকে ছোট। এছাড়া আছে নানান জাতীয় বিষাক্ত সাপ।

'এসব জন্তুদের মধ্যে' দীনবন্ধু কথা কেড়ে বলল : 'বাঁদরের আচরণ বড় অদ্ভুত।'

'কি রকম?'

'একবার দেখা গেল একপাল বাঁদর নদীর চরে জড়ো হল। তখন ভাটার সময়। ঐ দলের মধ্যে থেকে একটি বাঁদরকে টেনে এনে সকলে চাঁদা করে পেটাল। বাঁদরটা কিছু বলল না। পরে তারা বাঁদরটাকে চরের মধ্যে মুখটা বাদ রেখে পুঁতে দিল। তারপর তারা গাছের ডালে চড়ে মজা দেখতে লাগল।

জোয়ার এল। কলকল শব্দে জল বাড়তে লাগল। জল ক্রমশ বাঁদরটার মুখ পর্যন্ত উঠে এল। বাঁদরটা কিচির-মিচির শুরু করল। অন্য বাঁদর গুলো তখন ঝপাঝপ্ গাছ থেকে নেমে বাঁদরটাকে ডাঙ্গায় তুলে আনল।'

মনে হয় ঐ বাঁদরটা কোন অন্যায় করেছিল। তার জন্যেই শাস্তি। বাঁদররা কেমন দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, তার আর একটা কাহিনী দীনবন্ধু শোনাল।

আরেকবার দু'পাল বাঁদর দলবেঁধে জঙ্গলের দুপারে জমায়েত হল। মনে হল যেন যুদ্ধ হবে। একদলের দলপতি অপরদলের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গি করে কিচির মিচির করতে লাগল। একটি বাঁদরের দিকে বার বার হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

অপর দলের দলপতি খানিকটা এগিয়ে এসে অঙ্গভঙ্গি করে নিজের দল থেকে একটি বাঁদরকে টানতে টানতে নিয়ে এল। তারপর সকলে মিলে বাঁদরটাকে পিটতে লাগল। আধমরা করে ওরা ফিরে গেল। পরে ঐ বাঁদরটা সুস্থ হয়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিল। বেশ বোঝা যায় ওদের মধ্যে কেউ অন্যায় করলে ওরা যথাযথ তার বিচার করে।'

'আচ্ছা এ জঙ্গলে ভূত-প্রেত নেই?' শ্যাম প্রশ্ন করল।

মাঝি নড়ে চড়ে বসল। মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলল :

'আছে আছে। 'কুই' ডাকতে ডাকতে অনেক ভূত জ্যান্ত মানুষকে ভুলপথে নিয়ে গিয়ে মেরে দিয়েছে। জঙ্গলে যারা বাঘের পেটে গেছে, তাদের আত্মা বনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। তারাই সর্বনাশটা করে।'

'কুই ডাকা কি?'

মাঝি শোনাল : 'বনে জেলে, কাঠুরেরা কথা কয় না। তারা বিপদে পড়লে—কে কোথায় আছে মুখে 'কু' বা 'কোয়াক' শব্দ করে সঙ্গীদের জানায়। 'কুই' ডাকার আলাদা আলাদা ইঙ্গিতও আছে। সঙ্গীরা সব বোঝে। কেউ হয়তো মৌমাছির চাক খুঁজতে, মাছ ধরতে বা কাঠ কাটতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তখন 'কুই' ডেকে সঙ্গীদের খুঁজে নেয়। এই সুযোগ প্রেতাত্মা গুলো নেয়। এরা খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। 'কু' ডাকের উত্তর দিয়ে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে শেষ করে দেয়।'

মাঝি দুবার 'কুই' ডেকেও শোনাল। সারা বনময় সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বিশ্রামপর্ব শেষ। সূর্য পশ্চিমে হেলছে। বেশ হালকা হালকা লাগছে। ইচ্ছে হল হরিণের চারণভূমির কাছে যেতে। কাছাকাছি গেলাম। না, একটাও হরিণ চোখে পড়ল না। তবে পরিবেশটা বড় মনোরম লাগছে।

মাঝি বলল, নদীর ফিরতি বাঁক ঘুরে কিছুটা গেলেই দু তিনটে পোড়ো বাড়ি দেখতে পাবেন। এক সময় মানুষের বসবাস ছিল। বাড়িগুলি এখন বাঘেদের বিশ্রামাগার হয়েছে।

নদীর জল শান্ত। সূর্যের গোলাপী আভা আমাদের গায়ে উপছে পড়েছে। আকাশ অসম্ভব নীল। চারপাশে টু শব্দ নেই। এই অসম্ভব নীরবতায় হঠাৎ আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। গান গাইতে ইচ্ছে হল। আমরা গান ধরলাম। সারা বনজুড়ে আমাদের কণ্ঠস্বর ভাসতে লাগল। কি ভালই লাগছিল।

গান গাইতে গাইতেই আমরা মাঝ গাঙে ফিরে এলাম। সূর্য এখন টকটকে লাল। থালার মতো। সকলেই চেয়ে আছি। বাঘের কথা কারুর মনে নেই। মন লাল রঙে রেঙেছে। গান চলছে। কবিতা চলছে। অবিরাম, অবিশ্রাম। সূর্য ডুবে গেল। ধীরে ধীরে চাঁদমামা আকাশে উঁকি দিল। জ্যোৎস্নায় নদীর রূপও অপূর্ব লাগছে। মনে হয় রাতভোর চেয়েই থাকি।

হঠাৎ সকলেরই জলতেষ্টা পেয়ে গেল। এনতার মুড়ি খাওয়ার ফল। কিন্তু জলের ঘড়া শূন্য। দীনবন্ধু বলল, 'ছ' নম্বর লাটে (মানে; পাশের গ্রাম। এরা লাট বলে উল্লেখ করে) চলুন। জলখাওয়া যাবে।'

তার মানে আরও খানিকটা যেতে হবে। কেউ উৎসাহ দেখাল না। যাওয়াও হল না। সন্ধ্যে ছ'টায় আমরা নৌকা থেকে নামলাম। নেমেই স্থানীয় লোকের মুখে শুনলাম ছ'নম্বর লাটে একটি বাঘ উঠেছে। গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে আছে। কেউ বাড়ির বাইরে হচ্ছে না। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম, অর্থাৎ ছ'নম্বর লাটে না উঠে ভালই করেছি। হাঁটতে হাঁটতে প্রতিদান দুলুইয়ের বাড়িতে এসে আশ মিটিয়ে জল খেলাম।

ওখানে দেখা হল বিজয় মণ্ডলের বউয়ের সঙ্গে। পাঁচ ছেলে মেয়ের মা। বছর দুই আগে ওর স্বামীকে কেমন করে বাঘে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সে ঘটনা কেঁদে কেঁদে বললেন।

বিজয় মণ্ডল, পাঁচু কয়াল ও সুর্য দলুই এই তিনজনে জঙ্গলে মাছ ধরতে গিয়েছিল। বিজয় মণ্ডল ছিল বড় ওস্তাদ। খালেতে জাল পেতে মাড়িয়ে মাড়িয়ে বিজয় সামনে এগুচ্ছিল। উপর থেকে ঝপাং করে বাঘ পড়ল। বিজয়কে ধরে নিয়ে চলে গেল।' পাঁচু কয়াল 'দাদা' কোথায় দেখতে গিয়ে সেও বাঘের কবলে পড়ল। সুর্য দলুই প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে এল।

বিজয় মন্ডলের বউয়ের চোখ থেকে টপ্‌টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ওর কান্না দেখে আমাদেরও বুকটা মুচড়ে উঠল। সুন্দরবনের পল্লীতে পল্লীতে এরকম কত বিধবা যে আছেন তার ইয়ত্তা নেই। জেলে পাড়ায় 'বিধবা পল্লী' নামে একটি পল্লীই গড়ে উঠেছে। ওদের স্বামীরা বাঘের পেটে প্রাণ দিয়েছে। ভাবলে, ভারি কষ্ট হয়। তোমরাও নিশ্চয় আমার মতো কষ্ট পাচ্ছ, তাই না?

প্রতিদান দুলুইয়ের বাড়ি থেকে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা হেঁটে আমরা 'দুলকি' বলে একটি গ্রামে এলাম। দীনবন্ধু বলল, 'বাঘে ধরেছিল এমন একজন মানুষ এখানে আছে কথা কইবেন তো চলুন।'

তার বাড়িতে এলাম। দীনবন্ধু বলল, 'এই সেই বাঘে ধরা মানুষ—সুধীর গুড়িয়া।'

সুধীর দুহাত তুলে প্রণাম জানাল। সাদামাটা-কালোলম্বাপানা মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো। টুলে বসে পা ছড়িয়ে জাল বুনছে। পাশে ডিবিয়া জ্বলছে। এক সময় যে তাগড়াই চেহারা ছিল তা ওর কাঠামোটা দেখলেই বোঝা যায়।

জাল বুনতে বুনতেই গল্প শুরু করল সুধীর—

'আমরা ন'জন তিনটে নৌকা নিয়ে মাছ আর মধুর সন্ধানে গিয়েছিলুম মদনখালির অরণ্যে। সে বছর আট আগের কথা। দিনভোর জালা দুই মধুভাঙ্গা হল। মাছও বেশ মারা হল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে এবার বাড়ি ফেরার পালা। আমি ধুপ জেলে ঠাকুর প্রণাম সেরে নৌকোয় কাত মেরে ঝিমুচ্ছি। আমাদের সঙ্গের এক মুসলমান অন্য নৌকায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নামাজ পড়ছে। অন্যেরা যে যার নৌকায় এসে গাঁজায় টান দিচ্ছে। মনটা খুশীখুশী। যথেষ্ট সংগ্রহ হয়েছে। ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি ঠিক এমনি সময়ে মস্ত বাঘ আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডান হাতের দাবনা কামড়ে ধরে বনের দিকে ঘস্‌টে ঘস্‌টে নিয়ে যাচ্চে। আমি ছাড়াবার জন্য ঝাঁকুনি মারছি। দরদর করে রক্ত ঝরছে। তবু লড়ে যাচ্ছি। অন্য সকলে ভিরমি গেছে। বনের দিকে আমাকে অনেকটা এনে ফেলেছে। আর উপায় নেই।

হঠাৎ সতীশ হালদার বলে একটা লোকের জ্ঞান ফিরে এল। লোকটা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী। মুহূর্তে দু হাতে দুটো বাড়ি নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দমাদম বাঘের পেটে গায়ে, মুখে মারতে লাগলো। আর জোরসে 'কুই' মারতে লাগল। আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। অনেকটা রক্ত বেরিয়ে গেছে। তবু বাঁচার আশা ছাড়িনি। বাড়ির ঘা খেয়ে বাঘটা যেই কামড় আস্তে করেছে আমিও ঝট্‌কা মেরে নৌকার দিকে গুড়ি মারছি। ওদিকে সতীশের 'কুই' মারার শব্দে অন্য লোকগুলোর জ্ঞান ফিরে এল। ওরাও বাড়ি নিয়ে হই হই করে বাঘকে তেড়ে এল। 'মার ব্যাটাকে মার' ব্যস এই বুলি। বাঘ আমাকে ছেড়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। আবার লাফ মারার চেষ্টা করছে। শিকার কি সহজে ছাড়ে। এই ফাঁকে বন্ধুরা ঝট্‌তি আমাকে নৌকোয় তুলে—চড়া থেকে ঠেলে জলে ভাসিয়ে দিল।



জিনিসপত্র সব পড়ে রইল। বাঘটা নৌকার কাছ বরাবর তেড়ে এল। আক্রোশে ফুঁসতে লাগল। আমরা ফিরে এলুম। ছ' মাস হাসপাতালে থাকার পর ভাল হলুম। হপ্তা দুই পর বন্ধুরা আবার ঐ জায়গায় গিয়ে দেখে বাঘ রাগের চোটে মধুর জালা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বিছানা-মাদুর ছিঁড়ে দিয়েছে। সব পরিশ্রমই মাটি হল।'

আমরা সুধীরের জখম করা হাতটা দেখলাম। দুদিক থেকে দাঁতের মোক্ষম চিহ্ন। দাবনাটা কেমন সরু হয়ে গেছে।

সুধীর হেসে বলল: 'আর বনে যাই না। ছেলেরা যেতে দেয় না।'

'আপনার সেই বন্ধুরা ?'

সুধীর লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সকলেই বাঘের পেটে গেছে। সবই পেটের জন্য বাবু।'

সুধীর আরও জানাল—সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ঠাওর করা সম্ভব নয়। গাজিখালি, হলদিবাড়ি, চামটা প্রভৃতি এলাকায় যথেষ্ট হিংস্র বাঘ রয়েছে।

সুন্দরবনে প্রতি মুহূর্তে বিপদ। প্রতি মুহূর্ত ভয়ের। শুধু বাঘ,

সাপ, কুমিরের ভয়ই নয়, ডাকাতের ভয়ও যথেষ্ট। মধু, কাঠ, মাছ সংগ্রহ করে ফেরার সময় ডাকাতরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটপাট করে নেয়। মানুষ খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এভাবে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

অরণ্যে যারা যায় তারা সাধারণত দলের সঙ্গে গুনিন (ওঝা) নিয়ে যায়। এরা বাঘের মুখ মন্ত্রবলে বন্ধ করে দেয়। তাই গুনিনদের উপর বাঘেরা বেশী চটা। জেলে পাড়ার এক বিধবার মুখে শুনলাম, 'ঐ গুনিনদের জন্যই তো বাঘে চোট দেয় বেশী।'

এক ঠাকুমা গপ্পো বললেন—'বাঘটা গ্রামে ঢুকে একটা গরু মুখে নিয়ে যাচ্ছিল। পাশেই ছিল এক গুনিন। মন্ত্রবলে তিনি বাঘের চলাফেরা বন্ধ করে দিলেন। বাঘ গরু মুখে করে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে-চড়তে পারে না। চৌদিকে খবর রটে গেল। বন্দুকধারী শিকারী এল। গুনিন বললেন—এ অবস্থায় গুলি চলবে না। আমি ওকে ছেড়ে দেবার পর গুলি করবেন। তাই হল। বাঘটা গুলি খেয়ে খানিক দূরে আছড়ে পড়ল।'

রাত সাড়ে ন'টায় আমরা ডেরায় এলাম। বারবার খবর নিলাম ছ'নম্বর লাটের বাঘটা চলে গেছে কিনা। না, তখনও যায়নি ; গ্রামবাসীরা ভয়ে ভয়ে আছে। তোমাদের মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঘর থেকে বেরুতেই পাচ্ছে না। কি দুর্ভোগ বল দিকিনি। সত্যিই ওখানকার মানুষ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে।

গোসাবা ছেড়ে আসার সময়ও খবর নিলাম। বাঘটা তখনও যায়নি। কি হবে বলতো ?

রাজ্য সরকারের পর্যটন-বিভাগ তো লঞ্চে করে সুন্দরবন নিয়ে যাচ্ছে। এ সুযোগটা হাতছাড়া কোর না। বাবা-মাকে রাজি করিয়ে একবার বাঘের দেশটা ঘুরেই এস। সুন্দরবন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন।






রয় দ্যা ফিয়ারলেস

অজেয় রায়

সকাল দশটা নাগাদ। পশু চিকিৎসক জীবন দত্তর সঙ্গে থানার দারোগা ঘোষ মশায়ের দেখা হয়ে গেল। দুজনেই সাইকেলে চলেছেন।

"এই যে ঘোষ মশায় কদ্দুর ?" ডাক্তার দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

ডাক্তার দত্তর সঙ্গে দারোগাবাবুর বেশ আলাপ আছে। দারোগাবাবুর পোষা কুকুরটির পরিচর্যার জন্য মাঝে মাঝে দত্তর ডাক পড়ে। দারোগাবাবু হেসে বললেন, "এই যাচ্ছি সার্কাসের তাঁবুতে।"

"আরে আমিও তো ওইখানে।" বললেন দত্ত। "কি ব্যাপার ?"

"একটা ঝঞ্ঝাট বেঁধেছে। সার্কাসের ম্যানেজারকে চাই। সার্কাসের হাতি পথে যেতে যেতে একজনের বাড়ির মর্তমান কলার গাছের মুড়ো ভেঙ্গে খেয়ে নিয়েছে। থানায় কমপ্লেন করেছে গাছের মালিক। একটা ফয়সালা করতে হবে।"

"তা নিজে না গিয়ে ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেই তো পারতেন।"

"তা পারতাম। তবে আসলে কিনা"—লাজুক হাসলেন দারোগা—"সার্কাসের ভিতরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখার ইচ্ছে—কেমন থাকেটাকে—ভারি ইনটারেসটিং লাইফ কিন্তু। ম্যানেজার অনেকবার বলেছে যেতে। সময় পাইনি। ভাবলাম দু'কাজ এক সঙ্গে হয়ে যাবে। তা আপনি কি করতে ?"

অপ্রস্তুত হাসলেন ডাক্তার দত্ত—"মানে আমিও তাই। অনেক জন্তু-জানোয়ার আছে এদের। তাদের রোগ-টোগও হয়। আমার হেল্প নেয়। তাই খুশি রাখতে আমায় অনেকবার ডেকেছে ম্যানেজার। এই তো সেদিন সিংহের থাবা সেলাই করে দিলুম। খাঁচার গারদে খামচে কেটে গিছল। সত্যি খুব ইনটারেসটিং লাইফ ওদের। সকালে সব প্র্যাকটিস করে। আমি একটু-আধটু দেখেছি। ভাবলাম আজ ছুটি আছে, ভাল করে ঘুরে দেখব সার্কাসটা।"

"ভেরি গুড, চলুন তাহলে।" দারোগাবাবু সঙ্গী পেয়ে খুশি হলেন।

এই মফস্বল শহরে এক সার্কাস এসেছে দিন দশেক হল। দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস। তাঁবু পড়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। দর্শকের ভিড় হচ্ছে খুব। মস্ত মস্ত চিত্রবিচিত্র বিজ্ঞাপন পড়ছে শহরময়। গ্রাম

থেকেও দেখতে আসছে লোক। গরুর গাড়ির সারি পড়ে যায় পাশের মাঠে। এতবড় সার্কাস এ তল্লাটে আসেনি বহুকাল।

গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসে অনেক খেলা—মানুষের ও জীবজন্তুর। কিন্তু সব চাইতে বেশি লোক টানছে একটি নাম—রয় দ্যা ফিয়ারলেস। অর্থাৎ নির্ভীক রয়।

রয় হচ্ছে সার্কাসের রিংমাস্টার মানে পশু শিক্ষক। যেমন জাঁদরেল তার চেহারা তেমনি সাহস। ভয়ংকর বাঘ সিংহকে হুকুম মানায় যেন পোষা কুকুর বেড়াল। লোহার খাঁচার ভিতর পাঁচ পাঁচটা বাঘ সিংহকে একসঙ্গে নিয়ে ঢোকেন। হাতে স্রেফ একটি চাবুক। হিংস্র জন্তুগুলোকে ওঠান বসান খুশি মাফিক। রাগে গর গর করে পশুরা। রয় নির্বিকার। হাতের চাবুক আছড়ান বাতাসে। গম্ভীর কঠোর স্বরে আদেশ করেন। আর সেই আদেশ মানতে বাধ্য হয় বাঘ সিংহরা।

একেবারে শেষের খেলাটা সাংঘাতিক। কেশরওয়ালা একটা প্রকান্ড সিংহ বিরাট হাঁ করে। আর রয় তার হাঁয়ের মধ্যে নিজের মাথাটা পুরো ঢুকিয়ে দেন। রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকে দর্শক। একবার যদি জন্তুটার মেজাজ খিঁচড়ে যায়—ঝপ্ করে মুখ বন্ধ করে? ওই বিশাল ঝকঝকে ছুরির মতো দাঁতগুলোর চাপে মুড়মুড়িয়ে গুঁড়িয়ে যাবে মানুষের তুচ্ছ একটা মস্তক। একবার যদি ওর জেগে ওঠে লোভ। রসাল খাদ্যবস্তুটিকে মুখের ভিতর পেয়ে যদি রসনা সংবরণ না করতে পারে পশুরাজ?

খানিকক্ষণ এই অবস্থায় থেকে রয় তার মাথা টেনে নেন। হাসেন। প্রবল হাততালিতে অভিনন্দনের ঝড় ওঠে। দর্শকদের স্তব্ধ হৃৎপিন্ডগুলো ফের যেন স্বস্তিতে চালু হয়।

শুধু এই খেলাটা দেখার জন্যে এক একজন বারবার আসছে সার্কাস দেখতে।

'রয় দ্যা ফিয়ারলেস' নামটি সার্কাস পার্টিরই দেওয়া। সার্কাসের বিজ্ঞাপনের পোস্টারগুলোয় অন্য সব খেলার ফিরিস্তির সঙ্গে বড় বড় করে ছাপা থাকে—'রিং মাস্টার : রয় দ্যা কিয়ারলেস।' কোনওটায় ছবিও থাকে রয়-এর—সিংহের মতো ইয়া পাকানো গোঁফ। ঝকমকে পোশাক। হাতে চাবুক। ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চোখ।

সার্কাসের তাঁবুর কাছে এসে ডাক্তার দত্ত বললেন—"রিং মাস্টার রয়-এর খেলা দেখেছেন?"

"হুঁ, দেখেছি।" জবাব দিলেন দারোগা। "দারুন সাহস বটে লোকটার!"

দুই সম্মানিত অতিথির হঠাৎ আগমনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসের ম্যানেজার। "আসুন স্যার, আসুন। কি সৌভাগ্য।"

ম্যানেজার দুজনকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন, "একটু চা-টা হোক স্যার।"

দারোগামশাই চটপট কাজের কথা পাড়লেন।

ম্যানেজার সব শুনে তক্ষুনি ক্ষমা চেয়ে নিলেন তার হাতির বেয়াড়াপনার জন্য। বললেন যে, কলাগাছের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবেন।

কাজ মিটে গেলে দারোগাবাবু বললেন—"চা পরে হবে, আগে সার্কাসটা ঘুরে দেখতে চাই একবার। কেমন থাকেন আপনারা। একটা নতুন ধরনের লাইফ তো। কি বলেন ডাক্তার ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমারও তাই শখ।" সায় দিলেন ডাক্তার দত্ত।

"বেশ বেশ, আসুন স্যার।" ম্যানেজার মশাই পথ দেখালেন।

বড় তাঁবুতে খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিস তখন প্রায় শেষ। তারা ফিরে গেছে নিজের নিজের তাঁবুতে। কেউ কেউ বসে আড্ডা দিচ্ছে। তিনটি ছোট মেয়ে জিমনাস্টিক করছিল। দারোগাবাবুরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাই।

খেলা দেখানোর প্রধান তাঁবুর বাইরে এলেন তাঁরা। সারি সারি ছোট ছোট তাঁবু—সার্কাসের লোকেরা থাকে। জন্তু জানোয়ারদের খাঁচা। কোনও কোনও জন্তু শিকলে বাঁধা। কুকুরগুলো ছাড়া রয়েছে। তিনটে হাতি ম্যানেজারের অর্ডার মাফিক শুঁড় তুলে সেলাম জানাল অতিথিদের। কয়েকজন প্লেয়ারকে ডেকে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন ম্যানেজার।

"আচ্ছা রিং মাষ্টার রয়-এর তাঁবু কোনটা ? জানতে চাইলেন দারোগা।

"ওই যে।" আঙুল দেখালেন ম্যানেজার।

"একটু আলাপ করা যাবে ?"

"সার্টেনলি। ডাকছি।" ম্যানেজার মশাই রয়-এর তাঁবুর পর্দা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিলেন। মাথা নেড়ে বললেন—"উঁহু নেই তো। এই ভজুয়া, রায়বাবু কোথায় জানিস ?"

"আজ্ঞে চান করতে গেছেন।" বলল ঝাড়ুদার ভজুয়া।

"আচ্ছা ফিরে এলেই বলবি আমার কাছে যেতে, দরকার আছে।"

আরও খানিক ঘুরে দেখে তিনজনে আবার ম্যানেজারের তাঁবুতে ফিরে এলেন।

চা-য়ের পর্ব প্রায় সমাপ্ত। গল্পগুজব চলছে। একটা সোরগোল শোনা গেল বাইরে। কারও উত্তেজিত কন্ঠস্বর। তারপর ধুপ্ধাপ পায়ের শব্দ। কেউ যেন ছুটে আসছে এই দিকে।

'ম্যানেজার বাবু, আবার, ফের একটা"—কথাগুলি চেঁচিয়ে বলতে বলতে ম্যানেজারের তাঁবুতে ঝড়ের মতো এসে ঢুকলেন যে ব্যক্তি তাঁকে দেখে

ডাক্তার ও দারোগা অবাক। কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ং – রয় দ্যা ফিয়ারলেস।

"উঃ আর একটু হলেই মাড়িয়ে ফেলেছিলাম আর কি।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন রয়।

রয়-এর একি অবস্থা! পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি। মাথার চুলের একধার পাট করে আঁচড়ানো। অন্যধারের ভিজে চুল ঝুলে রয়েছে চোখের ওপর। অমন জমকালো গোঁফ জোড়া নেতিয়ে পড়েছে ঠোঁটের কোলে। তাঁর হাতে একটি চিরুনী। খালি পা।

"কি হল?" লাফিয়ে উঠলেন দারোগা। মুহূর্তে কোমরের খাপ থেকে টেনে বের করলেন রিভলবার। দাঁড়িয়ে উঠলেন ডাক্তার দত্ত।

ম্যানেজারের ঘরের দুই অতিথিকে এবার খেয়াল করলেন রয়। একটু থতমত খেলেন। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে চাপা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন—"ম্যানেজার মশাই, এই লাস্ট। হুম।" তিনি আবার দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন ম্যানেজারের তাঁবু থেকে।

দারোগা সাহেব ও ডাক্তার দত্ত রয়-এর পিছনে যাচ্ছিলেন। ম্যানেজার শশব্যস্ত হয়ে তাঁদের পথ আটকালেন। "না না, আপনার বসুন, আমি দেখছি। প্লীজ। আসছি এক্ষুনি।" মানেজার রিং মাস্টারকে অনুসরণ করলেন।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডাক্তার ও দারোগা।

"কি ব্যাপার?" বললেন ডাক্তার দত্ত।

"মনে হচ্ছে সাপ।" দারোগাবাবু জবাব দিলেন, "এই মাঠটা বোড়া সাপের আড্ডা। দেখলেন না অমন সাহসী লোকটা কি রকম ঘাবড়ে গেছে! তাঁবুর ভিতর সাপ ঢুকেছে নিশ্চয়ই। ভাল করে কার্বলিক এ্যাসিড ছিটানো উচিত।"

"হুঁ খুব বেঁচে গেছে।" সায় দিলেন ডাক্তার।

অতিথিরা ম্যানেজারের তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে রয়-এর তাঁবু খানিকটা দূরে, চোখের আড়ালে।

ম্যানেজারের হাঁক শোনা গেল—"ভজুয়া। এ ভজুয়া। ঝাড়ু লে আও। কুইক।"

ঝাড়ুদার ভজুয়াকে দেখা গেল প্রকান্ড এক ঝাঁটা হাতে উর্ধশ্বাসে দৌড়লো ওই দিকে। তারপর মাটিতে ঝাটা পেটার ঝপাঝপ আওয়াজ।

"সাপ মারতে ঝাঁটা কেন?" ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার। "হুঁ বুঝেছি সাপ নয় বিছে। কাঁকড়া বিছে। ঠিক। এ মাঠটা কাঁকড়া বিছের ডিপো। সাপের চেয়ে কম ডেনজারাস নয় ওগুলো।"

উত্তেজিত রয়-এর হুংকার কানে এল—"হাজার বার বলেছি ভাল করে ঝাঁট দিবি। সাফা করবি। নবাব পুত্তুররা কানে কথাই তোলে না। ম্যানেজার মশাই, এই লাস্ট ওয়ার্নিং। ফের এমনি হলে, ব্যাস। ওয়ান নাইট নোটিশ দিয়ে চলে যাব স্রেফ, এই বলে রাখছি।"

ম্যানেজার নিচু গলায় কি জানি বললেন। বোধহয় শান্ত করছেন রয়কে।

একটু পরে ম্যানেজার তাঁবুতে ফিরলেন। ঘাম মুছতে মুছতে অতিথিদের বললেন—"বসুন স্যার। আর একবার চা আনাই স্যার ?"

"না, থাক। ব্যাপারটা কি ? সাপ নাকি ?" দারোগা জিজ্ঞেস করলেন।

"না না।" ঘাড় নাড়লেন ম্যানেজার।

"বুঝেছি, কাঁকড়া বিছে।" রায় দিলেন ডাক্তার দত্ত।

"হুঁ, ওই আর কি। রায়বাবু একটুতেই এত নার্ভাস।"

"না না, কাঁকড়া বিছেকে নেগলেক্ট করবেন না। মারাত্মক জিনিস। বাঘ সিংহের চেয়ে কম নয়। ভাল করে ফিনাইল দেবেন, এ্যাসিড ছিটোবেন সাফসুফ রাখবেন।" উপদেশ দিলেন ডাক্তার।

"হুঁ।" নিস্তেজভাবে মাথা নাড়লেন ম্যানেজার। গল্প করার উৎসাহ যেন তার উবে গেছে।

"আজ উঠি।" বললেন দারোগা, "রায়বাবুর সঙ্গে আজ আর বোধহয়—মানে আলাপ টালাপ করা—?" জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন তিনি।

ভারি বিব্রত হয়ে এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন ম্যানেজার। "স্যার আর একদিন যদি—বড্ড আপসেট হয়ে পড়েছেন কিনা। দেখুন কি কাণ্ড।"

"তাতে কি, আসব আর একদিন। না, না, আজ আর বিরক্ত করবেন না ওকে।"

দুই অতিথি বিদায় নিলেন।

"ওফ্।" ধপ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের ম্যানেজার মশাই। বিড়বিড় করতে থাকেন—"মাইগড। খুব রক্ষে। এমন জোয়ান লোকটার কি কান্ড। ছি ছি মানে হয় ? জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি হতো। বারোটা বেজে যেত সার্কাসের। এ কি ভয় রে বাবা।"

উঁহু, কাঁকড়া বিছে দেখে ঘাবড়ান নি রয়। দুনিয়ার কোনও প্রাণীকেই কেয়ার করেন না 'রয় দ্যা ফিয়ারলেস'। না, শুধু একটি প্রাণী বাদে—তার নাম আরশোলা। ওই একটি জীবকেই তাঁর ভয়। ভীষণ ভয়। তাঁবুর ভিতর একটি ছোট তেলাপোকার আবির্ভাবেই তাঁর এই দিশেহারা অবস্থা।

এ কথা পাবলিক জানলে কি আর প্রেস্টিজ থাকবে ? আর কি জমবে তাঁর খেলা ?

ছটফটে ফিলিপ

(স্ট্রুভেলপেটার থেকে সাবধান করা ছড়া)



'দেখি যদি আজ ফিলিপ পারে
শান্ত বসতে চেপে চেয়ারে।
এই-যে খাবার, সে কি তা খাবে
ভব্য শিষ্ট ভদ্র ভাবে ?'

এই বলে বাবা শেখান তাকে।
অতি-গম্ভীর দেখায় মা-কে।
কিন্তু ফিলিপ, কী ছটফটে,
এ-সব কথায় মন কি ওঠে ?

যেন খেতে-বসা ভারি তামাশা
খেলা দেখাবার সময় খাশা :
এ-পাশে সে হেলে, না কি ও-পাশে
হো-হো হা হা হু-হু বেজায় হাসে।
অমনভাবে সে দুলছে কেন
দোলনাঘোড়ায় বসেছে যেন—
পিছনে সে হেলে, সামনে হেলে,
ছটফটে ছেলে, বেয়াক্কেলে !
'বোসো চুপ করে,' এই ধমকে
ছেলে হেসে ওঠে ধুমগমকে।

সত্যি বিষম অবাক মানি
দেখে ছেলেটার ছটফটানি।

ধমকালে হাসে, এত দুরন্ত !
এ যে দেখি হলো কলির অন্ত !
বাবা মা যতই রাগেন, মন্দ
ছেলেটার তত বাড়ে আনন্দ !
টাল সামলাতে না-পেরে শেষে
ধরলে টেবিলঢাকনা কষে,
তাতে গুরু হলো অবস্থা তো,
শুধু কি চেয়ার ভূমে পপাত ?
পড়লো ধপাশ্ সাথে সমস্ত
হরেক খাদ্য স্বাদু ও চোস্ত,
এবং বাসনকোশন সবই !
অর্থাৎ কি না এ বেয়াদবি
নির্ঘাৎ আনে শাস্তি খালি—
কোথা গেলো খাওয়া ? সে
গুড়ে বালি !
মা চ্যাঁচান জোরে আঁৎকে উঠি,
বাবার মুখে তো রাগি ভ্রূকুটি !
'সে গেলো কোথায় ? সে
ছেলে পাজি ?
দেখো, ওকে আমি কী করি আজই !'
চেয়ার উল্টে শুধু যে নিজে
পড়েছে ফিলিপ, তা নয়। কী যে
কাণ্ড করেছে চোখেই দ্যাখো
ফেলেছে খাদ্যবস্তু বেবাক ও—
থালা-বাটি ছুরি-কাঁটা সবই তো
পড়েছে সঙ্গে। সে নিজে ভীত
পড়ে আছে চিৎপটাং। গায়ে
টেবিলঢাকনাটাকে চাপায়ে !
এখন কী হবে ? রশুই তবে
নতুন করে কি পাকাতে হবে ?
বেচারি মা-বাবা। কেমন কষ্ট !
খাবারদাবার সবই তো নষ্ট !

—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জিভজড়ানো কথা

* লাল জল নীল নল *
* চাটুজ্জেদের ছাদ তেতেছে *
* আম পাতাটি বট পাতাটি *
* পাখী পাকা পেঁপে খায় *
* বামন বনাম মানব *
* তেলে চুল তাজা জলে চুন তাজা *

প্রফেসর চালাক চতুর চ্যাটার্জি

মিহির সিংহ

[ক্লাস সেভেন-এইটের ছেলেমেয়েদের জন্যে একাংকিকা]

পর্দা ওঠবার আগে কোলাহল। কাছে কোথাও ইলেকশানের মিটিং চলছে। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'বিপ্লবকে ভোট দিন' 'মজদুরদের প্রার্থী কে ?—বিপ্লব, বিপ্লব' 'মধ্যবিত্তের বন্ধু কে ?—বিপ্লব, বিপ্লব' 'মিল মালিকের সঙ্গে কে ?—বিপ্লব, বিপ্লব' 'আমাদের বিপ্-লব্—চলছে, চলবে' 'আমাদের বিপ্-লব্ – চলছে, চলবে'……মিছিল চলে গেল। পর্দা উঠছে। ভুবনবাবুর বৈঠকখানা। ছুটির সকাল।

বাইরে থেকে ফেরিঅলাদের ডাক; ভিখারীদের চেঁচামেচি। 'একটা পয়সা দেবে রাজাবাবু' 'হাঁসি হাঁসি পরবো ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী, একটা পয়সা দাও মা; কাল থেকে কিছু খাইনি মা' 'ঘড়ি গ্রামোফোন জরি বিক্রি করবেন পুরানা জুতো বিক্রি করবেন' 'কেলা চাই কেলা কেলা'।

বঙ্গচন্দ্র বাবু রাস্তা থেকে ঘরে ঢুকলেন। কোট-প্যাণ্ট-টাই। মেজাজ তিরিক্ষে। হাতের বইগুলো ধপাস করে টেবিলে ফেললেন। রুমাল বার করে ঘাম মুছছেন। কথায় কলকাতার টান।

বঙ্গ। হুঁঃ সাধে বলে আনকালচার্ড লোকেদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে ! নো এডুকেশন, নো অনেস্টি, নো ম্যানার্স, নো নাথিং। না আছে রিলিজিআন, না জানে হাইজিন, ব্যাটারা চেনে কেবল পয়সা। ভালোভাবে বললাম, বাপু হে গোটা দুই কলা ছাড়ো তো দিকি, সকাল বেলার ব্রেকফাস্টটা হয়নি, তাড়াহুড়োতে মানি ব্যাগটাও আনতে ভুলে গেচি, তা দামটা না হয় কালকেই নিয়ে নিও, আমি তো তোমাকে রোজই দেকি—সহর সুদ্দু লোক তোমাকে চেনে, আমিই নয় তোমাকে ডেকে দিয়ে দেবোকোন। তা কোত্তাকার আনপ্রিন্সিপ্‌ল্‌ড্‌ আপস্টার্ট ব্রুট, বলে কিনা ধারে এক জোড়া কলা দিতে পারবে না। তাও বুজিয়ে বললাম, মিষ্টি করেই বললাম, তুমি তো মুখ্যু, তুমি আর আমার মর্যাদা বুজবে কী করে ? এই হোলু তল্লাটে যা কিছু ফাইন কলার চাষ সে তো আম্মার বাপ ঠাকুদ্দারই হাতে, তা সে মর্ত্তমানই বলো আর খানদানি চাঁপা কলাই বলো। ওঃ

সে কাঁচকলাই যা ফলতো আমার মেজো মেশোর সেজো খুড়োর বাগানে, রাজভোগ ফেলে লোকে তাই খেতো কিনা ? তা কাঁচা পয়সার গরম তো, ব্যাটাচ্চেলে বলে কিনা, তো তাই খান তাহলে। আরে গেঁয়ো ভূত, সে বাগান যদি ওনারা ঐ জুট মিল বসানোর জন্যে বেচে—মানে দান না করে দিতেন—

য্যাপ্গে ঃ একানকার ব্রেকফাস্টটাতো বাঁদা আচে। ভরতভুবন বাবু বাড়ীর ভিতর থেকে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি। সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। অনেক দিনের পরিচিত হলেও এই সাত সকালে বঙ্গবাবুকে দেখে ভুরু কুঁচকে থমকে গেলেন পায়ের শব্দে বঙ্গবাবু ফিরে তাকাতেই হাত দিয়ে ভুরু সোজা করে, মুখের উপরে হাত বুলিয়ে এক গাল হাসি টেনে বললেন [কথায় বাঙাল টান]

ভুবন। আরে আরে ভায়া. খবরটা কী, অ্যাঁ ? আমি তো মহাব্যস্তই হইয়া পড়ছিলাম। সেই কাল সকালে চা জলখাবার খাইয়া গেলেন, আর তার পর থে টিকিটা দেখি না। ভাবলাম অন্তত বিকালেও আসবেন জল খাবারের সময়ে। আইলেন না। রাত্রেও আইলেন না খাইবার সময়। আমি তো ভাবি উৎকটরে একবার পাঠাই আপনার খোঁজে। তা দিদি বলে যে আসেনি যখন, তখন হয় প্যাট খারাপ করছে, ও তো চিরকালই প্যাটরোগা লোক। আর নয়তো—আঃ হাঃ হাঃ মা স্মাগো—

বঙ্গ। না না না না, আমি তো হলাম, ঐ কি বলে আপনার, মাই ফ্যামিলি-আর গোচের না ? আমি তো আসিই, আসবোও। তবে ঐ কি বলে আপনার, ফাস্টলি আই প্রোটেস্ট, আমি কোনোকালেই পেটরোগা নই। এটা দিদির জোক্ বলেই ধরছি। আসলে, সমস্ত সেনজিটিভ পার্সনের মতন আমি হলাম ঐ কি বলে আপনার, এ শহরের ব্যারোমিটার আর কি! ব্যারোমিটার। হাওয়ায় কোনো ইনফেকশানটি এয়েচে কি আমাকে অ্যাটাক করবেই। তার পরে ধরবে আপনাদের। [ভুবন বাবু ঘাবড়ে গিয়ে নিজের গলায় হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে দেখলেন জ্বরটর হয়েছে কিনা, পালস্ও দেখলেন।] কথাই তো আচে [বাঁ হাতের আঙুল নিজের বুকে ঠেকিয়ে, ডান হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে উঁচু করে আঙুল দেখিয়ে] হোআট বেঙ্গল ইনফেক্টস্ টুডে, ইণ্ডিয়া সাফা‌র্স টুমরো। তা আমার নামই তো বুজলেন না, হেঁ হেঁ, বঙ্গচন্দ্র, হেঁ হেঁ! আর সেকেণ্ডলি, আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি, কালকে হল কি, ঐ পারসী সায়েবরা, ঐ যে যারা নতুন চকচকে দোকানটা খুলেচে ? ওরা অ্যাত্তো পেড়াপেড়ি করল, ওদের বাড়ীতে ডিনারে বসতে, যে আর না বলতে পারলুম না। বেচারারা যদি মাইণ্ড করে! আফটার অল, আমি তো একটা ভদ্র বংশে জন্মিচি।

ভুবন। তা তো বটেই, তা তো বটেই [হাত দিয়ে উঁচু বাঁশের চেহারা দেখিয়ে] যে বংশের চূড়ায় আপনি —আঃ হাঃ হাঃ মা ম্মাগো—

উৎকট ঝাড়ন হাতে ঢুকতে গিয়ে বঙ্গবাবুকে দেখে মুখ ভ্যাংচালো। হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি।

ভুবন। ওরে বাবা উৎকট একটু চা-টা দেরে বাবা। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া বড় ক্লান্তি লাগেরে। দুই কাপই আন।

উৎকট। সে আমি জানি। জলখাবারও দুজনের মতন তো? [দর্শকদের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হেসে বাড়ীর ভিতরে গেল।]

ভুবন। উৎকট আপনারে বড় ভালবাসে। খাইবার সময় আপনার না দেখলিই জিজ্ঞাসা করে, সেই ব্যঙ্গবাবু আসেন নাই?

বঙ্গ। [অবাক হবার ভান করে] সে তো বটেই, সে তো বটেই। কিন্তু আপনার এত বেলা অব্দি চা খাওয়া হয়নি? মানে, ঐ কি বলে আপনার, ব্রেকফাস্টও হয়নি একনো? আমার তো সেই কোন্ কালে—

ভুবন। [আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে] না না, চা-জলখাবার তো ছুটির দিনে আমার দেরিতেই হয়। তাছাড়া আপনি আসেন তো? অভ্যাস হইয়া যায়। আপনি না আসা পর্যন্ত দিদিও আজকাল খাবার দিতি চায় না। বলে, ডবল হাঙ্গামায় লাভটা কী?

বঙ্গ। ছি ছি, সেকি কতা, অ্যাঁ, ভরত ভুবন বাবু? আমি একটা ব্যস্ত লোক, কত রকমের ইম্পর্ট্যাণ্ট এনগেজমেণ্ট থাকে আমার—

ভুবন। ও আমার অভ্যাস। ছেলেবেলায় এক ছাগল পুষছিলাম, সেটারে জানলায় না বাঁধলি খাওয়াই রুচতো না। দিদিও বলছিল, সেই একই গল্প। শ্যাষে ছাগলটারে খাইয়া, তবে না নিশ্চিন্ত।

রাস্তার দরজার পাশ থেকে এতক্ষণ একটি লোক উঁকি ঝুঁকি মারছিল। এবার খুব সপ্রতিভ ভাবে ঢুকল। চোস্ত্ কুর্তা-সানগ্লাস, চিবুকে ছোট্ট ফিট-ফাট দাড়ি, খুব চালাক একজোড়া সরু গোঁফ। খুব বিনীতও বটে।

চালাক। মে আই কাম ইন, জেণ্টলমেন, আসতে পারি?

ব.ভু. এক সঙ্গে। কে? কাকে চাই?

চালাক। আজ্ঞে আমার গত কালকের নাম ছিল চালাক। আজকের নাম চতুর। আগামী কাল থেকে হবে চ্যাটার্জি। আমি চাই? আমি চাই আপনাদের মতন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, হৃদয়বান, শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের। উৎকট চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে হাঁ করে শুনছিল। এখন সেও বলে উঠল:

ব. ভু. উ.। কেন? ক্যান্? কেন গো?

চালাক। হ্যাঁ, আমি আপনাদের এই ভৃত্যের মতন সরল মানুষদেরও চাই। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে চাই। রোজ রোজ না হোক, বছরে একবার

কি দু-পাঁচ বছরে একবার চাই। [প্রায় কেঁদে ফেলে] আপনারা না হলে যে আমার চলে না। [হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে] আপনারাই যে আমার সব! [উঠে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে ঘাড় উঁচু করে] আমিও যে আপনাদের সকলের সব! হে ভারত ভুলিও না —

বঙ্গ। [ব্যস্ত হয়ে] আপনি বসুন না, বসুন বসুন। ইনিই এ বাড়ীর কর্তা —

ভুবন। আজ্ঞে, ভরত ভুবন ভট্টশালী। বসেন বসেন। ওরে উৎকট। চালাকবাবুর জন্যিও চা আন। ইনি হইলেন—

উৎকট। { প্রায় একসঙ্গে } জলখাবারও আনি?
বঙ্গ। { প্রায় একসঙ্গে } বঙ্গ চন্দ্র বসু, এম. এ. ফেল্, ক্যাল্।

চালাক। [বসে পড়ে দুপেয়ালা চা-ই শেষ করে দিয়ে] না না আমার আর চা লাগবে না, আপনাদের জন্যে আনুক।

উৎকট। আজ্ঞে ফের তিন কাপই আনছি। [বাড়ীর ভিতরে চলে গেল]

দরজার পর্দার পাশ থেকে ভুবন বাবুর দিদি বেরিয়ে এলেন। দেখেই বোঝা যায় যে কোনো ইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস হতে পারেন।

দিদি। ও, আপনিই কি প্রোফেসার সি· চতুর?

চালাক। [চটপট উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে] মাতৃজাতিকে নমস্কার—

ভুবন। মাতৃজাতি কী মশয়? আমার দিদি!

চালাক। ওই হল। মাতৃজাতির মধ্যেই একটা উপজাতি হলেন আমাদের দিদিরা। ইস্কুলের দিদিমণিরা, কিম্বা ধরুন দিদিশাশুড়ীরা, মাতৃজাতীয়া হলেও আলাদা আলাদা উপজাতি। ও খুব সোজা জিনিস, অ্যালজেব্রাও লাগে না, জিওমেট্রি দিয়েই বুঝিয়ে দেবোখন একদিন?

ভুবন বাবু হতভম্ব। বঙ্গ বাবু বিজ্ঞের মতন ঘাড় নাড়ছেন, যেন সব বুঝে ফেলেছেন। দিদির হাতে কলম ছিল, তিনি সব টুকে টুকে নিচ্ছেন।

চালাক। হ্যাঁ, দিদিভাই যেন কী বলছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ; আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রফেসর সি. চতুর হল আমার শিক্ষক ভূমিকার নাম। [বিনীত ভাবে] আমার তো অসংখ্য ভূমিকা, তাই স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে নাম ভূমিকা পাল্টাতে হয়, [সকলের দিকে, দর্শকদের দিকেও ঘুরে তাকিয়ে] — আশা করি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের থিওরি অফ্ রেলেটিভিটি-টা অন্তত জানেন আপনারা? সবই আসলে রেলেটিভ্ তো? [খুব মিষ্ট হেসে] মানে ফিক্সড্ বলে তো কিছু নেই? যেটা মনে হচ্ছে স্থান, সেইটাই হয়ে গেল কাল। কালো-সাদা, ভাল মন্দ সম-স্তই রেলেটিভ্। তা সে থিওরিটা অন্তত জানা আছে তো?

দিদি কোনো সাড়া না দিয়ে নোট নিয়ে যাচ্ছেন। ভুবন বাবু করুণ মুখ করে ঘাড় নেড়ে জানালেন 'না'। বঙ্গবাবু তাঁর বইগুলো হাতে তুলে যেন দেখে নিয়ে, ঘাড় নেড়ে জানালেন 'হ্যাঁ'। উৎকট চায়ের ট্রে টেবিলে নাবিয়ে চালাক বাবুর পায়ের কাছে আশ্চর্য হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

চালাক। ধরুন, [উৎকট ভাবল চালাক বাবুর হাতে কিছু আছে, সেইটা ধরতে গিয়ে দেখে হাত খালি] ধরুন আমাকে বাদ দিয়ে আপনাদের মধ্যে কে সব চাইতে চালাক?

বঙ্গ। আমি।

ভুবন। ধ্যাৎ। আমি।

উৎকট। [আঙুল দেখিয়ে] দিদিমণি।

চালাক। আপনাদের এই ভৃত্যটিই এক অর্থে ঠিক বলেছে। বুদ্ধিই তো নারীর ভূষণ! তবু, আমি একটা পরীক্ষার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি, কে ঠিক কতটা চালাক তা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মাপা যাবে। Thorn to thorn মাপা যাবে। এবং সেই পদ্ধতিটা যদি আপনারা একবার ঠিক করে শিখে নেন তো আপনারাও মাপতে পারবেন।

দিদি। বাঃ তাহলে তো আমার ইস্কুলে খুব সুবিধেই হয়। এখন তো আবার অ্যাডমিশনের সময়।

চালাক। নিশ্চয়ই হয়। হয় কেন?—হবেই। আমি তো এখন সেইটা শেখানোর জন্যেই কিছুকাল নিজেকে উৎসর্গ করেছি।

উৎকট। [উঠে দাঁড়িয়ে, খুব ভক্তিভরে] উচ্ছগ্গ করেছো! আপনাকে নিজেকে!

চালাক। হ্যাঁ ভাই। উৎসর্গ করা, উচ্ছন্নে যাওয়া, মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন থাকা—এই সবই তো আমার জীবনের ব্রত। মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন থাকা। তা সে যাক। আচ্ছা, আপনাদের গায়ে মাদুলি ছাড়া আর কোনো ধাতুর স্পর্শ নেই তো? মানে কোনো পাওআরফুল মেটাল, যথা সোনা-রুপোর গয়না কি ঘড়ি কি আর কিছু? বা চাবি টাবি? সব খুলে টেবিলের উপরে ঐখানে নাবিয়ে রাখুন। ওসব পদার্থের ভাইব্রেশান এত বেশি যে মানুষের পারসোনাল ইকোএশান একেবারে উল্টে দেয়। টাকা পয়সারও বড় ভাইব্রেশান, বের করেই রাখুন। বেশ। পকেটে রুমাল আছে? [উৎকট তার নিজের হেঁটোধুতিতে পকেট খুঁজছে।] বা আঁচল দিয়ে কি কোঁচার খুঁট দিয়ে যে যার নিজের চোখ দুটোকে আচ্ছা করে বাঁধুন। [ভুবন বাবু উঠে দাঁড়িয়ে নিজের কাছা খুঁজছেন।] না না, কি বিপদ, কাছা নয়, কাছা নয়, কোঁচা, কোচা। এখন থেকেই কাছা-কোঁচায় গুলিয়ে ফেললেন! দুটোর আর্কিটেকচারই তো আলাদা। বেশ। বাইরের আলো একেবারে যাচ্ছে না তো চোখে?

বঙ্গ। [নিজের মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে] আমিই most cleverest, ও জানে না এখনো। [রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে বসে রইলেন।]

ভুবন। [দাঁড়িয়েই আছেন। নিজের পেটে আঙুল ঠেকিয়ে] নাঃ, ল্যাখাপড়া না শিখলিই বা কী? আমিই সর্বাপেক্ষা চালাক, নইলে আর এই বাজারে—[চোখের সামনে নিজেই আঙুল নাচিয়ে দেখছেন, কটা আঙুল তা দেখতে পাচ্ছেন কিনা।]

দিদি। [আঁচল থেকে চাবির তোড়াটা খুলে রেখে, চোখ বেঁধে] কী জানি বাবা!

চালাক। [সকলের চোখের বাঁধন পরখ করবার জন্যে জিভ ভেঙিয়ে, কলা দেখিয়ে, বক দেখিয়ে] বেশ, বেশ। এইবারই আমার আসল পরিশ্রম। সে যে কী পরিশ্রম তা আপনারা ভাবতেও পারছেন না। ধরুন দশ মিনিটের মধ্যে এক দৌড়ে এখান থেকে রেল স্টেশানে গিয়ে, টিকিট কেটে, ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেন ধরতে হলে যেমন পরিশ্রম হত, তেমনি পরিশ্রম! তা সে যাক। যার যা কাজ তা তো করতেই হবে। কিন্তু আপনাদেরও একটা ছোট্ট সহযোগিতা দরকার। আমি এবার আপনাদের পার্সোনাল র‍্যাডিয়েশান জোনের বাইরে থাকব। তার আগে, ওআন-টু-থ্রি বলা মাত্র আপনারা দুই আঙুল দুই কানে টাইট করে ঢুকিয়ে, এক থেকে পাঁচশ অবধি গুনবেন। খুব টাইট করে, বাইরের শব্দ যেন আপনাদের ভিতরের ওঙ্কারটাকে একটুও না ডিস্টার্ব করে। পাঁচশ পর্যন্ত গোনা হলে আস্তে আস্তে কান থেকে নিজের নিজের আঙুল খুলে, আঙুলের ব্যথাটা একটু মরলে, ধীরে ধীরে যে যার চোখের বাঁধন খুলে ফেলবেন। ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। প্রথমটায় একটু শর্সেফুল দেখবেন কিনা। আমার কাজও ওর মধ্যেই আশা করছি হয়ে যাবে। আপনাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্ব-বুদ্ধির রেশিওটা কষে বার করতে হবে তো! আর [উৎকটের গায়ে হাত দিতেই সে চমকে তিড়িং করে উঠল] তুমি ভাই অত গুনতে পারবে না; বসে থেকো, এই বাবু আগে নিজের চোখটা [বঙ্গবাবুর ঘাড়ে হাত দিতেই, তিনিও তিড়িং করে উঠলেন] খুলে, তারপরে তোমারটাও খুলে দেবেন। কেমন?

আপনারা সকলে বুঝেছেন তো? এখন কিছুক্ষণ তো পবিত্র নিস্তব্ধ অন্ধকারে থাকবেন? তার পরে চোখ-কান খোলার সময়ে হুড়োতাড়া করতে গেলেই মুশকিল। অবশ্য একটু আধটু শর্সেফুল সকলেই দেখে। বুঝেছেন তো? [দর্শকদের উদ্দেশ্যে।]

সকলে। হ্যাঁ।

চালাক। বেশ বেশ। এই তো চাই। ওআন-টু-থ্রি।

তার পরে যা হবার তাই হল। জড়ো করা ঘড়ি-গয়না ইত্যাদি তুলে নিয়ে, চাবির তোড়াটাও সাবধানে উঠিয়ে নিয়ে, সকলকে কলা দেখিয়ে, যেতে যেতে ফিরে এসে দর্শকদের নমস্কার করে, বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন চালাক বাবু। পর্দা আস্তে আস্তে পড়ে গেল।

তখনো গুনবার শব্দ আসছে—পঁচিশ-ছাব্বিশ সাতাশ-আঠাশ-উনত্রিশ-তিরিশ একত্রিশ-বত্রিশ—

চালাক বাবু দৌড়ে দর্শকদের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, হাতে একটা সুটকেস।

একটা দুর্গা দেখলাম চাচা

গেলাম গো হিন্দুর বাড়ি একটা দুর্গা দেখলাম চাচা
এক বেটি সিংগির পরে অসুরের টিকি ধরে
গলায় দিছে সাপ জড়াইয়া বুকে মারছে খোঁচা
ও মোর চাচা।
এক বেটার হাম্বা বদন কান দুইটা কুলার মতন
দাঁত দুইটা মুলার মতন মাথা লেপা পোছা
একটা দুর্গা দেখলাম চাচা ॥
ময়ূরের উপর বইছেন যিনি তার কেবল চিকচিকানি
মাথায় কাটছে টেরা সিঁথি ঝুলাইয়া দেছেন কোচা
ও মোর চাচা।
দুই দিকে দুইটা পরী রূপেতে বিদ্যাধরী
বীণা আর কেতাব লইয়া সরস্বতীর নাচা
একটা দুর্গা দেখলাম চাচা ॥
কুতকুতাইয়া আছে চাইয়া লক্ষ্মী নামে ঐ যে মাইয়া
মায়ের পেটের আর এক বইন চইড়া বইছে পেঁচা
ও মোর চাচা।
কোনায় দেখি রয় খাড়াইয়া শাড়ির বোরখা গায় পেচাইয়া
কেলা গাছের বউ আনছে দুর্গা বিবির বাছা—
হায় হায় আমার চাচা ॥
আশ্বিন মাসে হিন্দুরা হয় পাগল
পয়সা দিয়া কিন্যা আনে ছাগল
মাটির ঠাকুর কত রং কত প্যাখনার পূজা
শেষকালে তো জলে ভাসায়, হেয়াও এক মজা।
একটা দুর্গা দেখলাম চাচা ॥
দুর্গা, দুর্গা, জয় দুর্গা জয় কলকাতা,
জয় মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, দুর্গা মাঈ কী জয়।

[গ্রামের এক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলার কাছ থেকে ছড়াটি সংগ্রহ করেছেন শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার।]

চক্ষুকাণ্ড

তারাপদ রায়

[একটা এলোমেলো বসবার ঘর। কয়েকটা পুরনো বেতের চেয়ার ও কাঠের চেয়ার, যার পায়াগুলো কোনো অজ্ঞাত কারণে, লাল রঙ করা। একপাশে একটা নড়বড়ে টেবিলে কিছু খাতা বই, দেয়ালে কাগজ থেকে কাটা একটা সিংহের ছবি, তার নিচে ইংরেজি ও বাংলায় লেখা, 'Beware of Lion সিংহ আছে, সাবধান'। সামনের দরজায়ও একটা নোটিশ, 'উচিত মূল্যে পুরনো ডাকটিকিট ও মুদ্রা কেনাবেচা করা হয়।' নোটিশের নিচে একটা অতি বুড়ো লোম-ওঠা কুকুর শুয়ে, তারও পিঠে একটা নোটিশ আঠা দিয়ে আটকানো, 'ভয় নেই, দৈনিক কামড়ায় না, কাল কামড়িয়েছে, আজ কামড়াবে না।'

ঘরটি একতলায়, রাস্তার পাশে। এই ঘরের জানলার রোয়াকে বসে তাতাইবাবু একটা কাঠের বন্দুকের নলে এক চোখ গভীরভাবে নিবদ্ধ করে বাকি এক চোখ ভুরুসমেত বুজে আকাশে কোনো আপাত-অদৃশ্য বস্তুর দিকে তাক করছেন। এমন সময় ডোডোবাবুর প্রবেশ]

ডোডোবাবু : (তাতাইবাবুর বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা, তাতাইবাবু, একচোখ বুজলে যদি একমাইল দেখা যায়, দুই চোখ বুজলে কয় মাইল দেখা যাবে ?

তাতাইবাবু : (বন্দুকের নলে চোখ স্থির রেখে, ভীষণ বিরক্ত হয়ে) যাতা প্রশ্ন করবেন না। আপনি বলুন দেখি, এক চোখ খুললে যদি এক মাইল দেখা যায়, দুই চোখ খুললে কয় মাইল দেখা যাবে ?

ডোডোবাবু : (একটু বিজ্ঞ হয়ে) এ আর কি হলো ? আমি যা জিজ্ঞেস করলাম, এ ও তো সেই একই ধাঁধা।

তাতাইবাবু : (বন্দুক থেকে চোখ নামিয়ে, যথেষ্ট বিজ্ঞের মতো) আরে মশাই, সবই তো একই। একই ধাঁধাই তো চিরদিন চলছে, আমার ঠাকুমার কনে দেখার সময় আমার ঠাকুর্দার বড় মামা এই কথা প্রশ্ন করেছিলেন, বলতো, মা, এক চোখ বুজলে এক ক্রোশ, দু চোখ বুজলে কয় ক্রোশ ?

ডোডোবাবু : (বিস্মিত হয়ে) বলেন কি, অতদিন আগে এই ধাঁধা ?

তাতাইবাবু : (গম্ভীর হয়ে) অবশ্য তার একটা কারণ ছিলো। (একটু থেমে একটা ঝাঁটার কাঠি দিয়ে বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে) বুঝলেন, ঠাকুমাকে যেদিন দেখতে আসবে, ঐ কনেদেখা আর কি, তার

আগের দিন রাতে পাড়ার লোকদের সঙ্গে ঠাকুমা গিয়েছে নৌকোয় করে নদীর ওপারের হাটে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শুনতে। বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে চোখ মুখ ফুলে গেলো, ঠিক সারা চোখ মুখ নয়, দুটো চোখের মধ্যে একটা চোখ ফুললো, একটা ফুললো না, যেমন ছিল সেই রকমই রইলো।

ডোডোবাবু ঃ (অবাক হয়ে) মানে ?

তাতাইবাবু ঃ মানে, জলে ভিজে, ঠান্ডা লেগে মুখ ফোলা আর এক চোখে আঞ্জনি।

ডোডোবাবু ঃ তাই কি হলো ?

তাতাইবাবু ঃ আর কি হবে, ঠাকুর্দার বড়মামার গভীর সন্দেহ, তিনি আবার পুলিশের দারোগা।

ডোডোবাবু ঃ তখনো দারোগা ছিল নাকি ?

তাতাইবাবু ঃ ছিলো না, বলেন কি! না থাকলে আমার ঠাকুর্দার বাবার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা না খেয়ে মরে যেতো।

ডোডোবাবু ঃ (রীতিমত বিস্ময়ের সঙ্গে) ঠাকুর্দার বাবার শ্বশুর বাড়ি !

তাতাইবাবু ঃ কিছুই চট করে বুঝতে পারেন না, আপনার বুদ্ধি দিন দিন ঐ কুকুরটার লেজের মতো মোটা হচ্ছে। ঠাকুর্দার বাবার শ্বশুর বাড়ি মানে ঠাকুর্দার মামার বাড়ি।

ডোডোবাবু ঃ (আকস্মিক কটু বাক্যে আহত কণ্ঠে) ও, বুঝেছি, কিন্তু আপনার ঠাকুমার কি হলো ?

তাতাইবাবু ঃ আমার ঠাকুমার আর কি হবে, ঐ মুখ ফোলা গাল ফোলা নিয়ে, একটা চোখ প্রায় বন্ধ আর একটা চোখ গোল কুতকুতে, তাই নিয়ে সেজে গুজে বরপক্ষের সামনে এসে বসলো।

ডোডোবাবু ঃ (তাতাইবাবুর কথায় আকস্মিক বাধা দিয়ে) দেখুন তাতাই-বাবু আমার কিন্তু একটা কথা মনে হচ্ছে।

তাতাইবাবু ঃ (বাধা পেয়ে আবার চটে গিয়ে) আপনি তো মশায় মহা আহাম্মক আমার ঠাকুমার বিয়ের বিষয়ে আপনার কি মনে হতে পারে ?

ডোডোবাবু ঃ না, ঠিক আপনার ঠাকুমার বিয়ের ব্যাপারে নয়।

তাতাইবাবু ঃ তা হলে ?

ডোডোবাবু ঃ এই আমি ভাবছিলাম কি শিকারীদের, এই যারা বন্দুক দিয়ে শিকার করে তাদের, আঞ্জনি হলে খুব সুবিধা হয়।

তাতাইবাবু ঃ (একটু অবাক হয়ে) কি আবোল তাবোল বকছেন, শিকারী-দের আঞ্জনি হলে সুবিধে হয়, মানে ?

ডোডোবাবু ঃ মানে, আর কি। এই তাহলে আর কষ্ট করে বন্দুকের নলে চোখ রাখার সময় একটা চোখ খুলে একটা চোখ বুজে রাখতে হয় না।

তাতাইবাবু ঃ (উত্তেজিত হয়ে) চমৎকার বুদ্ধি আপনার, চমৎকার ইয়ার্কি দিতে শিখেছেন।

ডোডোবাবু ঃ না, না, ঠিক তা নয়। এই ভাবছিলাম আর কি। যা হোক, আপনার ঠাকুমার তারপর কি হলো ?

তাতাইবাবু ঃ তা দিয়ে আপনার কি দরকার ?

ডোডোবাবু ঃ বলুন না, একটা ভালো কথা বললাম, কত ভেবে চিন্তে বললাম, তাতেই যদি এ রকম রেগে যান।

তাতাইবাবু ঃ (কিঞ্চিৎ খুশি হয়ে) ঠিক রাগিনি, তবে বড় বাধা দেন আপনি। আর বাধা দিলে কিছুতেই বলবো না, আপনার সঙ্গে বাজে গল্প না করে বরং ঐ কুকুরটার লেজ বসে বসে সোজা করবো।

ডোডোবাবু ঃ আরে না, না। আপনি কি ঐ নোংরা কাজ করতে যাবেন। তার চেয়ে যা বলছিলেন বলুন, আমি এবার থেকে মন দিয়ে শুনছি।

তাতাইবাবু ঃ ঠাকুমার তো মুখ চোখের ঐ অবস্থা দেখে বরপক্ষের চক্ষু চড়ক গাছ। ঠাকুমার তো এমনিতেই রঙ ময়লা, তার উপরে চোখ মুখের ঐ দশা।

ডোডোবাবু ঃ আপনার ঠাকুমার রঙ ঠিক ময়লা বলা চলে না।

তাতাইবাবু ঃ তবে ফর্সা ?

ডোডোবাবু ঃ না, ফর্সা নয়, ময়লাও বলা উচিত নয়, একেবারে কুচকুচে কালো।

তাতাইবাবু ঃ (নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে) আপনি বাজে টিপ্পনি কাটবেন, না শুনবেন ? (অতঃপর স্বগতোক্তি) লোকটার সাহস খুব বেড়ে গেছে।

ডোডোবাবু ঃ আপনি যা বলছিলেন বলুন না। আমি শুধু আপনাকে একটু শুধরে দিলাম।

তাতাইবাবু ঃ আপনার শোধরানোর দরকার নেই, মন দিয়ে শুনুন। ঠাকুরদার বড়মামা ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চশমা আছে ? ঠাকুমা বললেন, না। চোখের ঐ দশা অথচ চশমা নেই, ঠাকুর্দার বড়মামা জানতে চাইলেন খালি চোখে কতটা দেখতে পারো ? বিকেল বিকেল ঠাকুমাকে দেখানো আরম্ভ হয়েছিলো, দেখানো হতে হতে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বারান্দায় মেয়ে দেখছিলেন ওঁরা, বারান্দার পুবপাশে আকাশে তখন সন্ধ্যাতারা জ্বল জ্বল করে আমগাছের মাথায় উঠেছে। ঠাকুমা সেই দিকে একবার তাকিয়ে তারপর মাথা নিচু করে বললো, আজ্ঞে খালি চোখে লাখ লাখ মাইল পর্যন্ত দেখতে পারি।

ডোডোবাবু ঃ মানে ?

তাতাইবাবু ঃ আবার মানে ? আপনি মশায় পুলিশের দারোগা হবেন। ঠাকুর্দার বড়মামা দারোগা মশায়ও নাকি বলেছিলেন, মানে ? ঠাকুমা তখন বুঝিয়ে বললো, আমি খালি চোখে ঐ তারাটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ঐ তারাটা নিশ্চয়ই লাখ লাখ মাইল দূরে রয়েছে।

ডোডোবাবু ঃ তারপর।

তাতাইবাবু ঃ তারপর আর কি ? ঠাকুমার বিয়ে হলো। তারপর বাবা। তারপর আমি। আমরা সবাই এখনো খালি চোখে লাখ লাখ মাইল দেখতে পারি। একটা চোখ বুজলেও দেখতে পারি ; একটা চোখ খুললেও দেখতে পারি।

[নোটিশের নিচে নিদ্রিত বৃদ্ধ কুকুরটি ইতিমধ্যে উঠে বসেছে এবং উঠে বসেই তার প্রথম কর্তব্য হলো মাথাটা ঘুরিয়ে নিজের পিঠের নোটিশটি খেয়ে ফেলা। ঘটনাটি ঘটা মাত্র ডোডোবাবু ছুটে গিয়ে কুকুরটির গলা চেপে ধরলেন, আর তাতাইবাবু পেন্সিল কাগজ নিয়ে বসে গেলেন নতুন করে নোটিশ লেখবার জন্যে *]



* এই শেষ অংশটুকু অভিনয়ের প্রয়োজনে বাদ দেওয়া যেতে পারে।


এই দেখ, আমার
জন্মদিনের উপহার
ইউকোব্যাঙ্ক-এর
পাসবই
ভারী মজার। এই একটা উপহার
আমাকে বছর বছর উপহার এনে দেবে।
ইউকোব্যাঙ্ক পাস বইয়ের মজাই তো
ঐখানে।
ভাগ্যিস্, মার মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল।
অবশ্য ইউকোব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ
দিই—আমার জমা পয়সা বছর
বছর বাড়িয়ে তোলার জন্যে।
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।
UCO/CAS-69/89 BEN